Socio-Cultural, Economic and Educational Status of Santal Tribes in Paschim Medinipur and Jhargram District

পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

SYNOPSIS

Submitted by

Rima Kisku

Reg. No: A00ED1300817

Supervised by

Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda

(Professor, Department of Education, Jadavpur University)

Department of Education

Jadavpur University

2023

সূচীপত্র

দাগ নং	**প্রথম-অধ্যায়ঃ গবেষণার পটভূমি**	পেজ নং
১.১	ভূমিকা	১
১.২	গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য	৬
১.৩	গবেষণার প্রশ্ন	৮
১.৪	গবেষণার উদ্দেশ্য	৯
১.৫	সমস্যার বিবৃতি	৯
১.৬	গবেষণার সুযোগ	১০
১.৭	গবেষণার সীমা নির্দেশকরন	১০
	দ্বিতীয়-অধ্যায়ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা	১২-২২
২.১	সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য	১২
২.২	গবেষণার খামতি/ শূন্যস্থান চিহ্নিতকরণ	২১
	তৃতীয়-অধ্যায়ঃ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের সম্পর্কে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ সমূহ	২৩-৩৫
৩.১	উডের ডেসপ্যাচ	২৩
৩.২	স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ	২৪
৩.৩	হান্টার কমিশন	২৪
৩.৪	কোঠারি কমিশনের সুপারিশ সমূহ	২৫
৩.৫	জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর সুপারিশ সমূহ	২৮
৩.৬	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প	৩২
৩.৭	সর্বশিক্ষা অভিযান	৩২
৩.৮	জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০	৩৩
	চতুর্থ-অধ্যায়ঃ গবেষণার পদ্ধতি	৩৬-৪১
৪.১	জনসমষ্টি	৩৬
৪.২	Sample বা নমুনা	৩৬
৪.৩	গবেষণার নকশা	৩৭
৪.৩.১	পর্যবেক্ষণ	৩৮

৪.৩.২	PRA (Participatory Rural Appraisal)	৩৮
৪.৩.৩	ফোকাস দল আলোচনা	৪০
৪.৩.৪	সাক্ষাৎকার	৪১
	পঞ্চম-অধ্যায়ঃ সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ	৪২-৪৮
৫.১	তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের বিশ্লেষণ	৪২
	ষষ্ঠ-অধ্যায়ঃ প্রাপ্ত ফলাফল ও তার আলোচনা	৪৯-৬২
৬.১	প্রাপ্ত ফলাফল	৪৯
৬.১.১	সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য	৪৯
৬.১.২	সাঁওতালদের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য	৫২
৬.১.৩	সাঁওতালদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য	৫৩
৬.২	আলোচনা	৫৫
৬.৩	শিক্ষা ক্ষেত্রে তাৎপর্য	৫৯
৬.৪	পরবর্তী গবেষণার সুযোগ	৬১
৬.৫	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৬২
	গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)	৬৩-৭০

প্রথম-অধ্যায়ঃ গবেষণার পটভূমি

১.১ ভূমিকা:

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২৪০-২৪২ বছর পূর্বে ল্যাটিন শব্দ "ট্রাইবাস" শব্দ বলতে বোঝাত টাইটেস, Ramnes, লুসেরস নামক তিনটি গ্রামীন গোষ্ঠীকে যারা রোম শহরের বাইরের বিভিন্ন গ্রামে থাকতেন। এই তিনটি গোষ্ঠী অর্থাৎ 'ট্রাই' থেকে 'ট্রাইবাস' শব্দের উৎপত্তি। 'আদিবাসী' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৩২ সালে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের শুরুতে 'আদিবাসী' শীর্ষক পত্রিকায়। জয়পাল সিং ঝাড়খন্ড আন্দোলনের প্রথম সারির অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি 'Scheduled Tribe' শব্দের পরিবর্তে আদিবাসী শব্দটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, যদিও বাবাসাহেব আম্বেদকরের আপত্তিতে তা তখন সম্ভব হয়নি। আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা সাধারণত যথেষ্ট দরিদ্র হন। অমর্ত্য সেন (২০২০, বিখ্যাত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ) লিখেছেন যে, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর মানুষেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে খুবই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছে। আর তার চাইতেও খারাপ অবস্থায় আছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

আর্যরা ভারতবর্ষে আসার পূর্ব থেকেই আদিবাসীরা ভারতবর্ষে বসবাস করতেন। তাঁরা নিজেদের মত করে একটি সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, যদিও সম্ভবত প্রথম মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন ফসিলস্ টি পাওয়া গেছে আফ্রিকাতে। ঐতিহাসিকদের মতে ওই ফসিলস্ এর বয়স আনুমানিক ৩.৩-৩ লক্ষ বছর পূর্বের। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা কয়েক লক্ষ বছর আফ্রিকাতেই বসবাস করতেন। আজ থেকে ৭০-৭৫ হাজার বছর আগে খাবারের

খোঁজে একদল মানুষ আফ্রিকা ছেড়ে বাইরের দিকে এগোতে শুরু করেন, মনে করা হয় যে এরাই ছিলেন সমস্ত মানুষের পূর্বজ (বন্দোপাধ্যায়) ।

পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে অসুর নামক উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস রয়েছে। মূলত চা বাগান এলাকায় এবং ডুয়ার্সের তরাই অঞ্চলের জঙ্গলের মধ্যে এরা বসবাস করেন। অসুরদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে 'আসুরিন'। কিন্তু বর্তমানে অসুর সম্প্রদায়ের খুব কম মানুষ নিজেদের ভাষায় কথা বলেন বা বোঝেন। অসুর সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষের একটি অতি প্রাচীন আদিবাসী সম্প্রদায়। ঋকবেদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে অসুর শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

আদিবাসী জীবন ও প্রকৃতির উপর আধুনিক সভ্যজগৎ নিরন্তর নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে চলেছে। কিন্তু তবুও আদিবাসীদের মধ্যে এখনো দেখা যায় প্রকৃতি এবং মানুষের সহ সম্পর্কের লালনকে। আদিবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে সহজীবী পরিবেশ সুরক্ষা করে আজও।

আদিবাসীরা জঙ্গলকে নষ্ট না করে জঙ্গলের উপবৃত্ত অথবা অপ্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেন জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রেখে। অরণ্য, ভূমি, নদী ও বিস্তীর্ণ প্রকৃতির বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার পেয়েও আজও আদিবাসীরা ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে অনাহার, দারিদ্র ও নিরক্ষরতা কে বরণ করে নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতি ১০ জন আদিবাসীর মধ্যে ৪ জনই নিরক্ষর, এবং প্রতি ১০০ জন আদিবাসী শিশুদের মধ্যে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়। এই শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ আদিবাসী সমাজের দারিদ্র্য, অনাহার এবং অবশ্যই নিরক্ষরতা।

ভারতবর্ষ একটি বহু জাতির দেশ। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রায় ৬৬৫ ধরনের আদিবাসী মানুষ ভারতে বসবাস করে থাকেন। তাঁরা হলেন- অসুর, মুন্ডা, ওঁরাও, মেছ,

রাভা, গারো, কোড়া, টোটো, সাঁওতাল প্রভৃতি। এই সকল আদিবাসী মানুষেরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিছিন্ন হয়ে পৃথক পরিবেশে বসবাস করেন। ভারতবর্ষে আদিবাসীরা হলেন সমাজ বহির্ভূত সম্প্রদায়। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীরা ভারতবর্ষে বসবাস করেন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতবর্ষে বসবাস করেন ১০.০৩ কোটি আদিবাসী মানুষ, যা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮.৩%। এদের মধ্যে ৮৯.৯৭% মানুষ বসবাস করেন গ্রামাঞ্চলে এবং ১০.০৩% মানুষ বসবাস করেন শহরাঞ্চলে। ভারতবর্ষের প্রতি ১০০০ জন আদিবাসী পুরুষের মধ্যে আদিবাসী মহিলার সংখ্যা ৯৯০ জন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ ধরনের আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা যায়। এদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ সব থেকে বেশি বসবাস করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাঁওতালরা অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন।

২০১১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী মানুষের সংখ্যা হল ৫২,৯৬,৯৫৩ জন, যেখানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ২৫,১২,৩৩১ জন। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের সাক্ষরতার হার ৪৩.৪%। যেখানে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৫৭.৪% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ২৯.২%। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ধরনের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সাক্ষরতার হার মোট ৪২.২%। এর মধ্যে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৫৭.৩% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ২৭%।

সাঁওতালদের বসবাসের স্থানের সংকুলান খুবই সীমিত। এদের সংস্কৃতি, নিয়ম-কানুন, ধর্ম এগুলিই এদেরকে অন্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে। সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে।

ডঃ ডি. এন. মজুমদার এর মতে সাঁওতালরা হলেন অনেকগুলি পরিবারের মিলিত রূপ যেখানে সদস্যরা একই জায়গায় বসবাস করেন। একই ভাষা বলেন, একই ধরনের কাজকর্ম করে থাকেন এবং একই ধরনের নিয়মকানুন মেনে চলেন।

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা সাঁওতালি ভাষা নামে পরিচিত। এই ভাষা মুন্ডা, হো, মাহালি, ভূমিজ, এবং খেড়িয়া ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। Peter W. Schmidt এই ভাষাগোষ্ঠী কে Austro-Asiatic ভাষাগোষ্ঠী বলে শ্রেণিকরণ করেছেন। সাঁওতালি ভাষা যেমন মুন্ডাপরিবারের ভাষার অন্তর্গত তেমনি অন্যান্য ভাষা গুলিকে নৃতত্ত্ববিদ্যায় শ্রেণিকরণ করা হয়েছে- Pre- Dravidians, Kolarians, Dravidians, Proto- Astraloids, Nishadies, and Austric প্রভৃতি। সামান্য কিছু বছরের মধ্যে সাঁওতালরা তাঁদের সাঁওতালি ভাষার লিপিকে উন্নত করেছেন, যা "অলচিকি" নামে পরিচিত।

স্বাধীনতার উত্তরযুগে এমনকি স্বাধীনতার পূর্বযুগে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালেও সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন উপজাতি সম্প্রদায় তাঁরা একদিকে যেমন ব্রিটিশদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন তেমনি অপরদিকে উচ্চজাতির মানুষেরাও সমান ভাবে অত্যাচার করে গেছেন। তাঁদের না আছে নিজস্ব বসবাসের স্থান, জমি, তেমনি তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কুল। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী, তবুও এই সমস্ত কিছুর পরেও সমস্ত ধরনের উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতালরা তুলনামুলুক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনীতিতে এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক নকশা লক্ষণীয়। এঁদের নিজেদের মধ্যে সংহতি আছে এবং জাতিগতভাবে এঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানত কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। এঁরা বাইরের সম্প্রদায়ের সাথে ব্যাবসা-বানিজ্যও করে থাকেন। এতদ্ সত্ত্বেও সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে অনেক দুর্বল। প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এঁদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। এঁদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর। ফলে এঁদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উন্নতি সীমিত। পূর্ববর্তী রীতি বজায় রেখে এঁরা একই ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদের মধ্যে নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এঁরা বাইরের সমাজ থেকে বিছিন্ন থাকতে এবং একই রকম ভাবে যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত জীবন যাপন করতে পছন্দ করেন। বিশ্বজিৎ পাল ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিভিন্ন উপজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নিরীক্ষণ করেন, যেখানে তিনি এই উপজাতিদের জীবনধারণের ধরণ, বাসস্থান, নিয়ম-কানুন গুলিকে লক্ষ্য করেন। গবেষণায় তিনি চারটি ভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক আচরণ কে লক্ষ্য করেন।

আদিবাসী সমাজে আদিবাসীদের উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। কারন তাঁদের বসবাসের মান খারাপ। ক্ষুধা, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসমস্যা প্রাত্যহিক জীবনের সাথে জড়িত। নিরক্ষরতা, বেকারত্বের অভিশাপ আদিবাসী সমাজের রোজনামচা। যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, তার সাথে প্রয়োজন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি। পরিবর্তনের আধুনিক প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় শিল্পায়ন, নগরোন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নতি প্রভৃতি। উপজাতি সম্প্রদায় এতদ্

সত্ত্বেও উন্নয়নের সুফল প্রাপ্তি থেকে বহুদূরে রয়েছে। দেশ নির্মাণ এবং সুনাগরিক তৈরীর জন্য শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বিষয়। মানবীয় সংস্থানের উন্নতির জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। শিক্ষা মানুষকে দেয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং চরিত্র। স্বাধীনতার পরে ভারত সরকারের সাক্ষরতা মিশন 3RS (Reading, Writing and Arithmetic) এর ওপর জোর দিয়েছেন এবং রাজ্যসরকার গুলিকে নীতি নির্দেশ মেনে জনগণের চাহিদা পুরনের জন্য সক্রিয় হতে বলেছেন। শিক্ষা হলো ক্ষমতায়নের সামনের দরজা। এটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের কার্যকরী সরঞ্জামও বটে। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার অন্যান্য উচ্চ জাতির মানুষদের তুলনায় অনেক কম এবং তাঁদের পড়াশোনার প্রতি অনীহা দেখা যায়। বেশিরভাগ সাঁওতাল মহিলারা বাড়ির বাইরে কাজ করেন এবং তারা বিভিন্ন ধরনের দিনমজুরির কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। অল্পবয়সী মেয়েরাও তাদের মায়ের সাথে বাড়ি থেকে অনেক দূরে কাজ করতে যায়। বেশিরভাগ সময় তারা প্রত্যহ স্কুলে যেতে পারে না বা যেতে চায় না এবং স্কুলছুট হয়। গরিব পরিবারের পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে চান না কারণ বাচ্চারা তাদেরকে বাড়ির কাজে সাহায্য করে ফলে বাড়ির মহিলারা তাদের পারিবারিক কাজের চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

১.২ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য :

আদিবাসীদের সমাজ প্রাচীন যুগ থেকে মোটামুটি ভাবে অপরিবর্তিত। বিভিন্ন সময়ে বাইরের বিভিন্ন চাপের মুখে দাঁড়িয়েও আদিবাসী সমাজ এখনো তাদের প্রাচীন ধ্যান ধারণা গুলিকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য সক্রিয় হয়েছেন। বাইরের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন, খাদ্যাভ্যাস, জীবন চর্চা, বাড়ি-ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংগীত-নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা এখনো

পর্যন্ত সামাজিকভাবে এঁরা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। স্বাধীনতা লাভের পর পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে গিয়ে কোন কোন আদিবাসী মানুষ নিজেকে কিছুটা পরিবর্তিত করলেও সামগ্রিকভাবে এখনো তাঁরা অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীরা জল, জঙ্গল, জমি, পাহাড় ইত্যাদির উপর আবহমান কাল ধরে নির্ভরশীল। তাদের এই নির্ভরশীলতা প্রকৃতির সঙ্গে তাদেরকে সহজীবি সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে। এখনো জমি চাষ, মাছ ধরা, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প ইত্যাদির উপর এরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। জঙ্গল থেকে পরিবারের প্রয়োজনে জ্বালানি, শুকনো কাঠ, ঔষধি গাছ, ছাতু (মাশরুম), মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করলেও কোন ক্ষেত্রেই জঙ্গলকে এরা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান না। কারণ জঙ্গল, পাহাড়, ঝরণা, নদী এদের কাছে ঈশ্বরের থেকে পবিত্র দান হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন আদিবাসী পরিবার অর্থনৈতিকভাবে চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গেলেও সামগ্রিকভাবে এখনো আদিবাসী সমাজ চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা তুলনামূলকভাবে উন্নত হলেও এখনো চূড়ান্ত দারিদ্র্যের শিকার। এরা যে সকল স্থানে বসবাস করেন সেখানে উন্নত পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ সংযোগ, চিকিৎসার সুযোগ, এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রায়শঃই পাওয়াই যায় না। এদের অধিকাংশ জনই আধুনিক প্রযুক্তি সমূহ যেমন দূরদর্শন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এতদ্ সত্বেও এরা এখনো সঠিক ভাবেই এবং নিজেদের মতো করে নিজেদের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যান। এদের জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি হল চিরাচরিত

সংস্কৃতি ও প্রথা সমূহ। ধর্মীয় অনুশাসন, জীবনযাপনের নীতিসমূহ, এবং সর্বোপরি সততা, এদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ভাষা, অন্যান্য অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর থেকে অনেকাংশে পৃথক। পারস্পারিক যোগাযোগের জন্য এরা বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকেন যেটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। তাই তাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে কতখানি পরিবর্তন এসেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এটিও সত্যি কথা যে একটি সমাজের সংস্কৃতির অনুশীলনকে গাণিতিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। আবার একইভাবে বাইরে থেকে কোন কোন ধরনের সংস্কৃতি আদিবাসী সমাজের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে তা বাইরে থেকে বলা সহজ নয়। একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিকে জানতে গেলে সেই সংস্কৃতির একজন হয়ে উঠতে হবে। তাই বর্তমান গবেষিকা সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষা কে অনুধাবন করবার প্রচেষ্টা করেছেন ওই সমাজের একজন সদস্যা হিসেবে।

১.৩ গবেষণার প্রশ্ন :

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান কি?

২. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থান কি?

৩. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা কি?

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য :

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থাকে তুলে ধরা।

২. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরা।

৩. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষার বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরা।

১.৫ সমস্যার বিবৃতি :

বর্তমান এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে Ethnography পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যাকে জানা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষের মধ্যে যান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথাগুলির গুরুত্ব হারাচ্ছে। এর ফলে যে কোন সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আদিবাসী সমাজ বিশেষত সাঁওতাল সমাজেও এর ব্যতিক্রম পাওয়া যায় না। একদিকে সাঁওতাল সমাজের চিরাচরিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রথার প্রতি সাঁওতাল সমাজের আঁকড়ে থাকার প্রবণতা এবং অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বায়নের ও পাশ্চাত্যকরণের ঢেউয়ে সাঁওতাল যুবক যুবতীদের গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এই দুইয়ের মধ্যে সাঁওতাল সমাজের বর্তমান অবস্থাটিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

তাই বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল- পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করা।

১.৬ গবেষণার সুযোগ :

বর্তমান গবেষিকা নিজে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একজন সদস্যা হওয়ার কারণে এবং সাঁওতাল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে তাঁদের সমস্যাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং পূর্বের গবেষণাগুলিতে সাঁওতালি সংস্কৃতি, ভাষা, চিরাচরিত নিয়ম-নীতি, প্রথা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষাগত সমস্যা নিয়ে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থাকার সম্ভাবনা ছিল সেই অভাব গুলি পূরণের জন্য বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা চেষ্টা করেছেন। তিনি সামগ্রিক কোন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেননি, বরঞ্চ অনুপুঙ্খ এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতা গুলিকে তৃণমূল স্তর থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যেখানে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে। তাঁদের ভাবনা এবং মূল্যবোধ বর্তমান গবেষণায় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১.৭ গবেষণার সীমা নির্দেশকরণ :

বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল– "পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা"। একজন গবেষিকার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সমস্ত সাঁওতাল সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা প্রায়

অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানত ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মালদহ সহ উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি এলাকায় বহু সংখ্যক সাঁওতাল বসবাস করেন। তাই সমস্ত এলাকার সাঁওতালদের নিয়ে গবেষণা করা একক কোন গবেষণায় সম্ভব নয়। তাই এ সমস্যাটিকে নিয়ে গবেষণা করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এর সীমারেখা নির্দেশ করণ প্রয়োজন বলে গবেষিকা মনে করেছেন। এই গবেষণার সীমায়িতকরণের ক্ষেত্রগুলি হল-

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম কেবলমাত্র এই দুটি সাঁওতাল অধ্যুষিত জেলাকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কেবলমাত্র তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকের একটি করে সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রূপ মোট কুড়িটি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. তথ্য সংগ্রহের জন্য সেমি- স্ট্রাকচারড সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং Participatory Rural Appraisal (PRA) পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়-অধ্যায়: সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

২.১ সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য:

গুহ, এবং ইসমাইল (মে-জুন ২০১৫) পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের গবেষণা পত্রটির শিরোনাম- "Socio-cultural changes of tribes and their impacts on environment with special reference to santal in West Bengal" গবেষকরা তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি গড়ে তোলেন- ১. আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করা। ২. আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি, সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং প্রসারের ওপর আলোকপাত করা। ৩. আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি এবং শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে অর্থনেতিক বাধার রূপরেখা তৈরি করা। গবেষক এই গবেষণা পত্রে আগেই উল্লেখ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল জাতি একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। তাঁদের জীবনের একটি বড় অংশ হল তাঁদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা এবং কারুকার্য। তাঁরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বছরের সমস্ত সাংস্কৃতিক উৎসব গুলি পালন করেন। তাঁরা নিজস্ব গান, নাচ, এবং বাজনা যেগুলি ধামসা, মাদল নামে পরিচিত এগুলির মাধ্যমে উৎসবে আনন্দ করেন। তাঁদের নিজস্ব ভাষা সাঁওতালি এবং বাংলা ভাষাতেও তাঁরা যথেষ্ট সাবলীল। এঁরা ভীষণই শান্তপ্রকৃতির হয়ে থাকেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন।

ডঃ সরেন, (জুলাই ২০১৩) সাঁওতাল জাতির স্থানান্তর সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা পত্রটির শিরোনাম- "Impact of globalization on the santals: A study on migration in West Bengal, India." গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য

ঠিক করেছেন - ১. সাঁওতাল গোষ্ঠীদের মধ্যে দেশান্তরের ফলে তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষিকাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করা। গবেষক এই গবেষণা কর্মটিকে সম্পাদন করার জন্য মোট ১৪৭ জন নমুনার কাছ থেকে field survey এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক তাঁর গবেষণার ফলে নিম্নের বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন- স্থানান্তর সাঁওতালদের ঐতিহ্য কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে।স্থানান্তর তাদের চাষবাসের ধরণ, রান্না খাওয়ার অভ্যাস, ভাষা, পোশাক, পরিচ্ছদ, রাজনৈতিক সচেতনতা, সঞ্চয়ের অভ্যাসকে প্রভাবিত করে। স্থানান্তর যখন গ্রাম থেকে শহরে হয়, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের শিশুদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে, উচ্চমানের স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলে। বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার যেমন-ডাইনি প্রথা, ওঝা, গুনিন প্রভৃতি ধারণা থেকে বেরিয়ে আসে।

শ্রীমতি সেন (৩ মার্চ, ২০২১) বীরভূমের সাঁওতালদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- “Socio cultural transformation of santal in Bolpur, Shantiniketan of Birbhum district, West Bengal.” গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি গড়ে তোলেন- ১. সাঁওতালদের জীবন যাত্রার সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিরূপণ করা। ২. শান্তিনিকেতনের আশ্রম এর সাথে সাঁওতালরা কতটা জড়িত। ৩. শান্তিনিকেতনের ইতিহাস জানা। গবেষিকা তাঁর এই গবেষণা কর্মটিকে সম্পাদন করার জন্য মোট ৩২৮ জন নমুনার কাছ থেকে প্রশ্নাবলী, নিরীক্ষণ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং এই জাতির বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হল - সাধারণভাবে সাঁওতালদের জীবন যাত্রা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরিচালিত হয় ওই স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা। বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাঁওতালরা প্রকৃতি এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সাথে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। যা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে, বিশ্বায়ন এবং প্রকৃতিবাদের দর্শনে বিশ্বাস করে। বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রম অন্যান্য স্থানের সাঁওতালদের মত তাদের কে আলাদা করে রাখেনি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও এই অঞ্চলের সাঁওতালদের সাদরে গ্রহণ করেছে। বিশ্বভারতীর সাথে সাঁওতালদের সম্পর্ক শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য নয়, বরং শান্তিনিকেতন সাঁওতালদেরকে প্রশিক্ষণ দেয় বিভিন্ন রকম শিল্প কলা এবং বিশ্বভারতীর গ্রামীণ পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে। যেটা তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার অভ্যাসকে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সাঁওতালদের থেকে তাদেরকে আলাদা করে।

আহমেদ, এবং তত্ত্বসারানন্দ (২০১৯) ঝাড়গ্রাম এর সাঁওতালদের আধুনিকতা এবং শিক্ষার উপর একটি গবেষণা করেছেন যার শিরোনাম হলো - "Modernization and the educated and non-educated santals of Jhargram: ethnographic study."

গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন - আধুনিকতার প্রসঙ্গে শিক্ষিত সাঁওতাল এবং অশিক্ষিত সাঁওদের মধ্যে সম্পর্ক। গবেষকগণ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য PRA, participant observation, FGD, semi-structured interview schedule, ঘরোয়া এবং পারিবারিক নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে ৪৯৬ জন নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পারিবারিক নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে গবেষকগণ শিক্ষিত

সাঁওতাল এবং অশিক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। গবেষণায় খুঁজে পাওয়া গেছে যে গবেষণা স্থলে অশিক্ষিত সাঁওতালদের তুলনায় শিক্ষিত সাঁওতালরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে উন্নতিকরণ প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতি, এবং নতুন দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

মিশ্র (নভেম্বর, ২০১৪) মালদা জেলার সাঁওতালদের শিক্ষামূলক সচেতনতার উপর একটি গবেষণা করেছেন যার শিরোনাম হলো – "Educational awareness of tribal people (santal) in Malda district, West Bengal."

গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. মালদা জেলার সাঁওতালদের বসবাসের ধরন, শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ- সুবিধা, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপ করা। ২. গবেষণাপত্রে উল্লিখিত স্তর অনুযায়ী চল গুলির মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা।

গবেষক তাঁর গবেষণা কাজের জন্য ১০০ জন্য নমুনার কাছ থেকে interview scale for assessing educational awarness of Santali people, এবং structural interview scale এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক তাঁর গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি খুঁজে পেয়েছেন - ১. শিক্ষা ক্ষেত্রে সচেতনতা আনার জন্য গবেষণাপত্রে যতগুলি মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য তার প্রত্যেকটা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ২. উন্নত সাক্ষাৎকার স্কেল এর সাহায্যে অভিপ্রেত চল গুলিকে মাপা হয়েছে এবং এটি স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে বিন্যাস হয়েছে।

মন্ডল (ডিসেম্বর, ২০১৮) আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন, গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হলো- "Socio economic status of tribal people Mukundapur village, West Bengal. "

গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য উদ্দেশ্য ঠিক করেছেন- ১. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা যা আদিবাসীদের ভিন্ন অবস্থান তৈরি করে। ২. তাদের শিক্ষার সমতা এবং আয় এর সমতা মূল্যায়ন করা। ৩. তাদের জীবনধারণের কৌশলের উপাদানগুলি অন্বেষণ করা ৪.বর্তমান সমাজে তাদের ভূমিকা এবং অবস্থা নির্ধারণ করা।

গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য ৫৭ টি বাড়ির উপর qualitative এবং quantitative method ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষিকা তার গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে বর্তমানে এই গ্রামের শিক্ষার অবস্থা নগণ্য, গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো ভীষণ জরুরী। এক্ষেত্রে সরকারের কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী প্রকল্প গুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তাদের শিক্ষার মান উন্নত হলে তাদের পেশার পরিবর্তন হবে এবং আয় এর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

দে (জুলাই-আগস্ট, ২০১৫) সাঁওতালদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। যার শিরোনাম হল- "An ancient history: ethnographic study of the Santhal " গবেষক তাঁর গবেষণা পত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ঠিক করেছেন- ১. সাঁওতালদের জীবন যাত্রা খোঁজা। ২. সাঁওতালদের প্রকৃতি, অভ্যাস, সংস্কৃতি ও সমাজকে খুঁজে বের করা। ৩. সাঁওতালদের ঐতিহ্য বহনকারী জীবনযাত্রা এবং পরিবর্তনশীল জীবন যাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের

করা। ৪. সাঁওতাল জাতিসমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ খোঁজা। ৫. সাঁওতালদের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বের করা।

গবেষক এই গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য descriptive method ব্যবহার করেছেন। গবেষক গবেষণা কাজটি শেষ করার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে খুঁজে পেয়েছেন - সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনের মান আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষার প্রসার এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার তাদেরকে নতুন চাষের পদ্ধতি, রান্নার ধরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পোশাক, রাজনৈতিক সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। গ্রাম থেকে মানুষ যখন শহরে যায় তখন তারা বুঝতে পারে তাদের বাচ্চার জন্য শিক্ষা কতটা জরুরি, তারা উন্নত স্বাস্থ্য গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কুসংস্কার যেমন ডাইনি প্রথা, ওঝা প্রভৃতি বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসে।

সাহা (১২ ডিসেম্বর, ২০২১) উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর গবেষণা করেছেন। শিরোনাম হলো – "Socio economic condition of Tribal people: A study on Uttar Dinajpur district of West Bengal. "

গবেষক তার গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান খুঁজে বের করা। ২. উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের কাজে অংশগ্রহণের হার দেখা। ৩. এই জেলার আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা গুলি কে খুঁজে বের করা।

গবেষক এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সরকারি রিপোর্ট, জার্নাল, বই এবং ২০১১ এর আদমশুমারি প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছেন। এই গবেষণায় প্রধানত descriptive method ব্যবহার করেছেন।

গবেষক এ গবেষণাটি করে নিম্নলিখিত ফলাফল টি খুঁজে পেয়েছেন যে, উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীরা সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ পিছিয়ে আছে। শিক্ষার হার, শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং সচেতনতা না থাকার জন্য আদিবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন হচ্ছিলেন। ২০১১ এর আদমশুমারিতে দেখা গেছে এখানকার আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসী মানুষেরা উন্নয়নের পথে চলতে শুরু করেছেন। তাঁদের নিজস্ব চেষ্টা এবং শক্তি ভীষণ জরুরি তাদের ভালো থাকার জন্য।

দত্ত এবং বিশাই (২০২০) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এবং শিক্ষার প্রবণতা সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্র টির শিরোনাম হল - "Literary Trends and Difference of Schedule Tribes in West Bengal : A Community Level Analysis."

গবেষকবা এই গবেষণা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন - ১. পশ্চিমবঙ্গের জাতিগত সম্প্রদায়ের বর্তমানে শিক্ষার প্রবণতা বিশ্লেষণ। ২. পুরুষ এবং মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণের হার এর মধ্যে পার্থক্য। ৩. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী মহিলাদের শিক্ষাগত অবস্থান উল্লেখ করা।

গবেষকদের গবেষণাটি করার জন্য Effectively Literary rate এবং Literary Growth Rate মেথড ব্যবহার করেছেন।

গুহ এবং দাস (২০১৩-২০১৪) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের শিক্ষাগত উন্নতি সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "Educational Advancement of Schedule Tribe in West Bengal (1947-2011)".

গবেষকদ্বয় তাঁদের গবেষণা পত্রে খুঁজে পেয়েছেন যে শিক্ষায়ই আদিবাসী উন্নয়নের চাবিকাঠি। পশ্চিমবঙ্গে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত শিক্ষামূলক পরিকল্পনার ফলে এই রাজ্যের তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়গুলি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি করেছে। তারপরও এখানে উল্লেখ্যে যে এই উন্নতিতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না, কারণ শিক্ষার অগ্রগতির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে তাই এখন সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো দ্রুততার সাথে আদিবাসী সমাজকে অবগত করা যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তফসিলি উপজাতিরা অন্তত আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য উন্নত অংশের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে। ১১ টি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে। তবুও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার উন্নয়ন একেবারেই ধীর, সুতরাং শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা এবং উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ছাড় দিয়েও কেন তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় তার কারণ খুঁজে বের করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

চক্রবর্তী, ঘোষ এবং পান্ডা (২০১৯) পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল- "Unravelling the Socio-Economic Condition of Tribal Peoples in West Bengal". এই গবেষণা কাজটি

সম্পন্ন করার জন্য গবেষকগণ নিম্নলিখিত মেথডের ব্যবহার করেছেন- (১) identification of respondent, (২) identification of Civil and economic condition, (৩) education of the respondent's response to construct the social economic condition through ranking and voting.

গবেষকগণ এই গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে - আদিবাসী ও উপজাতীয়দের অধিকার সারা বিশ্বে প্রায় সব ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গত কয়েক দশকে গতি লাভ করেছে ILO, এর দ্বারা পরিবর্তিত পরিবর্তনের মাধ্যমে। আদিবাসী আন্দোলন পরবর্তীকালে UNDRIPS এর সাথে একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে পৌঁছেছে। ১৬৯ নম্বর কনভেনশন এর ৩০ বছর পর শুধুমাত্র ২৩ টি দেশ কনভেনশন টি অনুমোদন করেন। বেশিরভাগ স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মতো ভারত এই কনভেনশনটি অনুমোদন করেনি এবং এখনো সেকেলে ILO (১০৭) নিয়ে চলেছে যা একটি ঐতিহাসিক ভুল হিসাবে সমালোচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ দেশের মতো ভারতও UPR জমা দিতে বাধ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত UPRS এর কোনটিতে ভারতে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে না। এই গবেষণাটিতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। কর্মচারী,সমাজকর্মী, এনজিও পেশাদারদের কিছু উপলব্ধি ও উন্নয়ন প্রকল্প এবং জীবিকার আরো ভালো বাস্তবায়নের মধ্যে সুপারিশের একটি সেট অনুসরণ করা হয়েছে।

২.২ গবেষণার খামতি/ শূন্যস্থান চিহ্নিতকরণ:

পশ্চিমবঙ্গে যে ৪০ প্রকারের আদিবাসী রয়েছেন সাঁওতাল গোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যার বিচারে সাঁওতালদের সংখ্যা সর্বাধিক। তাই আদিবাসীদের উপর যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ এবং নৃতাত্ত্বিকরা গবেষণা করেছেন তাদের একটি বড় অংশ সাঁওতালদের বিষয়ে গবেষণাতে যুক্ত হন। গবেষিকা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষিকা গবেষণা হয়েছে। ৪৯ টি সংশ্লিষ্ট গবেষণা পত্রকে দীর্ঘকাল ধরে পাঠ করেছেন। তার অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণায় অভাব রয়েছে সেই বিষয় চিহ্নিত করনের চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপর খুব বেশি গবেষণা হয়নি এবং যা হয়েছে তাও খণ্ডিত। এই খন্ডিত চিত্রগুলিকে একত্রিত করে উল্লিখিত দুটি জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ-সাংস্কৃতিক, আর্থিক অবস্থা এবং শিক্ষার চিত্র অংকন করা সম্ভবপর নয়, কারণ সমাজ এবং সংস্কৃতি যেমন পরস্পর গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে, ঠিক তেমনি করে সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আবার সমাজ- সংস্কৃতি এবং সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা যেকোনো সমাজের বিশেষত আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে আদিবাসী সমাজে শিক্ষার প্রকৃত অবস্থান নির্ধারিত হয় তার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা। তাই বর্তমান গবেষিকা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সমাজের সামাজিক-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক এবং

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন এবং নিম্নলিখিত গবেষণার শিরোনামটি প্রস্তুত করেছেন- "পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা"।

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের সম্পর্কে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ সমূহ

৩.১ উডের ডেসপ্যাচ:

ব্রিটিশ সরকারের বোর্ড অফ কন্ট্রোল এর সভাপতি স্যার চার্লস উড মনে করতেন যে ভারতে সার্বিকভাবে শিক্ষার বিস্তার করলে ইংরেজ সরকারের এদেশের স্থায়িত্বের কোন আশঙ্কা থাকবে না। বরঞ্চ এদেশের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ ইংরেজদের স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়ক হবে। তাই স্যার চার্লস উডের নির্দেশে একটি মূল্যবান শিক্ষা দলিল রচিত হয় ১৮৫৪ সালে। যেহেতু স্যার চার্লস উডের নির্দেশে এই শিক্ষা দলিল রচিত হয়েছিল তাই একে উডের ডেসপ্যাচ বলা হয়।

উডের ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে যে ব্রিটিশ সরকার এ যাবৎ ভারতবর্ষের সার্বিক জন শিক্ষার সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ জনশিক্ষাকে অবহেলাই করে গেছেন। জনশিক্ষা বলতে আপামর সাধারণ মানুষের শিক্ষাকে বোঝায়। এই সাধারণ মানুষ বলতে মূলত ভারতবর্ষের তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষকে বোঝানো হয়। বাস্তবিকই ব্রিটিশ সরকার মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চ জাতির উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করেছেন। ফলে সাধারণ জনগণের বিশেষত তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। অর্থাৎ 'চুঁইয়ে নেমে আসা নীতি' (Filtration Theory) এর নিন্দা করা হয়েছে উডের ডেসপ্যাচে। উডের ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে যে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক প্রচেষ্টা না থাকলে এই বিশাল দেশের পিছিয়ে পড়া জন সম্প্রদায়ের জন্য উন্নত গুণমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র বেসরকারি

প্রচেষ্টায় সাফল্য আসতে পারেনা। এর জন্য উডের ডেসপ্যাচ এ বলা হয়েছে প্রতিটি জেলার বিভিন্ন স্থানে সাধারণ জনগণের জন্য একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এবং এইগুলি হবে মূলত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশীয় স্কুলগুলির মান উন্নত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বিশেষত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনার জন্য এবং তাদেরকে ধরে রাখার জন্য নিয়মিত ছাত্র বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং উডের ডেসপ্যাচে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে গণশিক্ষার বিস্তারের স্বপক্ষে বলা হয়েছে। যার মধ্যে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৩.২ স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ (১৮৫৭):

স্ট্যানলির শিক্ষানীতি বিষয়ক ডেসপ্যাচে উডের ডেসপ্যাচ কে সমর্থন করা হয়েছে। এবং তিনি গণশিক্ষা বিস্তারের পক্ষ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে স্ট্যানলি পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। ভারতের নিজস্ব দেশজ শিক্ষার ধারাকে তিনি বুঝতে পারেননি।

৩.৩ হান্টার কমিশন (১৮৪২):

হান্টার কমিশন বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্নদের ক্ষেত্রে বেতন গ্রহণের স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষা বোর্ড পরিকল্পিত বা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের দরজা কে সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হান্টার কমিশন

বুঝেছিলেন জাতিভেদ প্রথার কুফল গুলিকে। তাই তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই কমিশন সুস্পষ্ট মতামত ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.৪ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ (১৯৬৪-১৯৬৬):

ভারতের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত। তাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ গুলি হল –

১. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার বিষয়ে যে সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলিকে বহাল রাখতে হবে এবং এই সকল সুবিধাকে আরো বাড়াতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অনুন্নত শ্রেণি বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। জনবিরল অঞ্চলে বিশেষত বনাঞ্চলে আদিবাসী শিশুদের জন্য আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৩. আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও ডে স্কুল সেন্টারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৪. তপশিলি সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর সম্পূর্ণ করতে পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

৫. তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে আগ্রহী করতে এবং ধরে রাখতে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাতে বহুল পরিমাণে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করেন সে বিষয়ে

কমিশন দৃঢ় মতামত দিয়েছেন। কারণ পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর আদিবাসী ছেলে মেয়েরা অতিরিক্ত তাত্ত্বিক বিষয়কে সহজে গ্রহণ করতে এবং ধরে রাখতে পারে না।

৬. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য সংগঠন তৈরি করতে হবে। যেখানে প্রথম সাধারণ শিক্ষিত মানুষ তার দায়িত্ব নিলেও ধীরে ধীরে উদ্যোগী এবং মেধাবী যুবকদের এই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। আদিবাসী যুবকরাই আদিবাসী এলাকায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকে বিকশিত করতে সমর্থ হবেন।

৭. যাযাবর এবং অর্ধ যাযাবর শ্রেনীর ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন।

৩.৪.১ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর ব্লকের গগনাশুলি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী গগনাশুলি গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল গগনাশুলি গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - বিভিন্ন জায়গাতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেল আছে এই গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেছে যার ফলে এই গ্রামের ১০ জন ছেলে-মেয়ে কলেজ স্তরের শিক্ষা শেষ করেছে। ৩ জন কলেজ যাচ্ছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পেয়েছে।

৬. সংগঠন পরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতা এবং ছেলেমেয়েদের সচেতনতার জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৩.৪.২ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী ঝাড়গ্রাম জেলার বড়াশুলি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - কোঠারি কমিশনের এই সুপারিশ অনুযায়ী বড়াশুলি গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল বড়াশুলী গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের ২০-২৫ জন স্কুলে যায়। এই গ্রামে চারজন স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এবং এদের মধ্যে দুজন মহিলা আছে। সঠিক গাইডেন্স এর অভাবে অচিরেই ছেলেমেয়েরা স্কুলছুট হয়ে যায়।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্র ছাত্রীরা কেউই কোন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পায়নি।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

৩.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর সুপারিশ সমূহ:

তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে নিম্নলিখিত সুপারিশ গুলি করা হয়েছে-

১. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের এলাকাগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যাতে দূরত্বের কারণে তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় বিমুখ হতে না পারে।

২. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা তাদের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা সহ ইংরেজি ভাষাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনা। এই কারণে এদের মধ্যে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা অধিক, তাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের যতখানি সম্ভব তাদের

মাতৃভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. তপশিলি উপজাতিদের জন্য পাঠক্রম রচনা করতে হবে উপজাতীয় ভাষাতে। তাই উপজাতীয় ভাষাতে বই রচনা করতে পারলে এই সকল শিক্ষার্থীরা অধিক আগ্রহী হবে।

৪. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় ও আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উপরে গুরুত্ব সহকারে সুপারিশ করেছেন জাতীয় শিক্ষানীতি।

৫. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত কারণে যেহেতু উচ্চ শিক্ষায় যেতে আগ্রহী নন তাই তাদের জন্য তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কারিগরী শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

৬. দারিদ্র্যের কারণে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের আগ্রহ থাকলেও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ নিতে পারেনা। তাই তাদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক আর্থিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা রাখার পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে।

৩.৫.১ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপী বল্লভপুর ১ ব্লকের মাঠাসাই গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী মাঠাসাই গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলির শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সময়ের সাথে সাথে অনেক বেশি পাচ্ছে।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল মাঠাসাই গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। হাইস্কুল দূরে হলেও যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হয় না।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের ১০-১২ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। ৫ জন ছেলেমেয়ে কলেজ পাস করেছে। বর্তমানে আরো পাঁচজন ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - মিড ডে মিল, কন্যাশ্রীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায়।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

৩.৫.২ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী মাঠাসাই গ্রামে বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না। এই গ্রামে অলচিকি স্কুল নেই।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ৪ জন চাকরি করে। পড়াশোনার থেকে খেলাধুলায় বেশি আগ্রহী। ছেলে মেয়ে যদি স্কুলে না যায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়িতে এসে বাচ্চাদের খোঁজখবর নেন এবং স্কুলে নিয়ে যান। তাই পড়াশোনার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে অধিকাংশ পরিবারের মেয়ারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়না।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম থাকলেও নির্দিষ্ট ভাবে কোন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৬ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প:

১৯৯৬- ৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ তাত্ত্বিকভাবে শুরু হয়। ১৯৯৭-৯৯ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় (বীরভূম, কোচবিহার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, উত্তরদিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই প্রসারিত হয়। এই প্রকল্পে তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য পৃথক করে কিছু বলা হয়নি। তবে সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু (পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) সম্পূর্ণ করতে পারে এবং পরবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মা-মেয়ে মেলা, লোকগান, কবিগান, ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বসাধারনের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই বিষয়ে অবগত করানো হয়েছে।

৩.৭ সর্বশিক্ষা অভিযান:

২০০২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযানের কাজ শুরু হয়। সর্বশিক্ষা অভিযানেও তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নয়। তবে পশ্চাৎপদ অঞ্চল গুলিতে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গঠন উপযুক্ত নয় বা শিক্ষকের সংখ্যা কম রয়েছে সেই

সকল ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার, নতুন ভবন তৈরি এবং শিক্ষক নিয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরাও অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভের সুযোগ পেয়েছে।

৩.৮ জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ (NEP 2020):

১৯৯২ সালে যে National Policy of Education বা শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছিল তাতে মূলত শিক্ষার সমান অধিকার ও সকলের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরে ১৯৯২ সালে এই বিগত শিক্ষানীতির সংশোধিত রূপ আনার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। আরো পরে ২০০৯ সালে পেশ করা একটি আইনে বিগত শিক্ষানীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। বিশেষত শিশুদের জন্য সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

২০২০ সালে ভারত সরকারের অধীন শিক্ষা মন্ত্রক যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করেন সেখানে সকলের জন্য পক্ষপাতহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আর্থ-সামাজিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা ভৌগোলিক পরিচয়ে যারা পশ্চাদপদ রয়েছেন তাদের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এখানেও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় বিশেষের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দানের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ এর তথ্য অনুসারে তপশিলি জনজাতির শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার ১০.৬১% (প্রাথমিক স্তরে) এবং ৬.৮% (উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে)। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি থাকা তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর অসময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা

থেকেই ঝরে পড়ার প্রবণতা অধিক। এর কারণ হিসেবে NEP (2020) জানিয়েছেন যে উচ্চ গুনমান সম্পন্ন বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এছাড়াও আদিবাসী মানুষদের সামাজিকতা রাজনীতি সামাজিক প্রথা ভাষাগত সমস্যা ইত্যাদিকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর না হওয়ার অন্যতম কারণ বলে জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) তে স্বীকার করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে অতীত কাল থেকে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত তপশিলি উপজাতি ভুক্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিখন ফলাফলের বাধা গুলিকে অতিক্রম করানো বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে তপশিলি উপজাতি শ্রেণীভুক্তদের শিক্ষার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবার তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুরা চিরাচরিত ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক কারণে শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেজন্য এরা প্রায়শই স্কুল শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগতভাবে তাদের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক ও বিদেশী বলে মনে করে। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বাস্তবভিত্তিক এবং সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরই সাথে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলিকে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টিকে নিশ্চিত করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দানের কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিশেষত মেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে সে বিষয়ে গবেষণার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন আদিবাসী ছেলে মেয়েরা গ্রাম থেকে

অনেক দূরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াত করে প্রায়শই দীর্ঘ জঙ্গল পথ অতিক্রম করে। তাই তাদের জন্য সাইকেলের ব্যবস্থা করা, দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করা এবং তাদের জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের জন্য প্রয়োজনে বুদ্ধিদীপ্ত এবং এগিয়ে থাকা সহপাঠীদের দ্বারা পাঠদান, মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা, উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং যথার্থ প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অরণ্য সঙ্কুল পাহাড়ের উপর বা পাহাড়ের তলদেশে যে সকল আদিবাসী মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করছেন, তাঁদের এলাকায় তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ছাত্র-ছাত্রীর আবাস যুক্ত বনবাসী বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া। এর লক্ষ্য হল এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব চেনা পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তাদের বসবাসের সমপরিবেশে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে ভাববে না। সুতরাং এদের শিক্ষার জন্য সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে হলে গবেষণার ফলাফল ভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

চতুর্থ-অধ্যায়ঃ গবেষণার পদ্ধতি

৪.১ জনসমষ্টি বা Population:

যে কোনো ধরনের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য জনসমষ্টির ধারণাকে সুস্পষ্ট করতে হয়। একটি জনসমষ্টি বলতে একটি বড় দলকে বোঝায়। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা সমসত্ব জনসমষ্টিকে (Homogenous Population) গ্রহণ করেছেন। এখানে এই জনসমষ্টিতে যে নমুনা অর্থাৎ মানুষেরা রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাঁওতাল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই সাঁওতালি ভাষা বোঝেন এবং এই ভাষায় কথা বলেন। সাংস্কৃতিক এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে এরা প্রায় সকলেই একই বৈশিষ্ট্য যুক্ত।

৪.২ Sample বা নমুনা:

জনসমষ্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ হল নমুনা। জনসমষ্টির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তা ছোট দলের মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিভাত হলে তবেই ছোট দলটিকে জনসমষ্টির নমুনা বলা হবে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বহু মানুষের মধ্যে গবেষণার প্রয়োজনে গবেষিকা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ২০ টি ব্লকের মধ্য থেকে ২০ টি সাঁওতাল গ্রাম বা পাড়ার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষকে গবেষণার নমুনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষিকা উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনা চয়ন (purposive sampling) প্রণালী গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতিতে যে সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়েছেন তাঁরা দুটি জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিভূ। এই পদ্ধতিতে

গবেষিকার পক্ষে তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজ হয় অথচ গবেষণার উদ্দেশ্য কোনভাবেই বিঘ্নিত হয় না।

৪.৩ গবেষণার নকশা:

বর্তমান গবেষণাটি সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষিত বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় গবেষিকা গবেষণার নকশা হিসেবে Ethnography পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায় গবেষিকা বিভিন্ন সাঁওতাল গ্রাম বা পাড়ায় যেখানে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে কিছুদিন করে বসবাস করেছেন, মানুষ জনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ আলোচনা করে কাটিয়েছেন এবং খুব কাছ থেকে তাদের সংস্কৃতিকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং এরদ্বারা কথোপকথন কালে তারা কি বলছে এবং বাস্তবে তারা কি করছে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করার চেষ্টা করেছেন

Ethnography পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য গবেষিকা এই পদ্ধতির চারটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ ভাবে মেনে চলেছেন-

১. গবেষিকা গবেষণার মধ্যে গভীরভাবে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, যাতে তিনি বিষয়নিষ্ঠভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

২. গবেষণাতে যারা তথ্য দান করেছেন তাদের দৃষ্টিকোন থেকে বর্তমান সমস্যাটিকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন।

৩. গবেষিকা তাঁর গবেষণায় অনেকখানি সময় তথ্য সংগ্রহে ব্যায় করেছেন এবং ওতোপ্রোতভাবে তাদের সঙ্গে মিশেছেন।

৪. গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন টেকনিক ব্যবহার করেছেন, যেমন- পর্যবেক্ষণ, PRA, FDG, ডাইরি লিখন, পূর্বতন দলিল সমূহকে গভীরভাবে পঠন ও তার বিশ্লেষণ, ছবি সংগ্রহ, রেকর্ডিং ইত্যাদি।

৪.৩.১ পর্যবেক্ষণ:

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা সুসংগঠিত এবং অসংগঠিত এই উভয় প্রকারেরই তথ্য গ্রহণ কালে তথ্য দাতাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন, প্রাপ্ত তথ্য এবং অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তথ্যের বিশ্লেষণ এবং তার ব্যাখ্যা দানের চেষ্টাও করেছেন।

৪.৩.২ PRA (Participatory Rural Appraisal):

গবেষিকা প্রথম নির্দিষ্ট গ্রাম/পাড়ার মাঝখানে একটি সাধারণের ব্যবহৃত স্থানে সকলকে জড়ো করেন এবং মাদুর/শতরঞ্জি/চাটাই পেতে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসেন। তিনি তার আসার কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন এবং সবাইকে (মহিলা,পুরুষ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান। এই পর্যায়ে গবেষিকা তার গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলেন এবং কারুর কোন প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। গবেষিকা এবার সাদা রংয়ের আর্ট পেপার মেলে ধরেন এবং কম বয়সী যুবক যুবতীদের হাতে একটি করে পেন্সিল ও রঙ্গিন স্কেচ পেন ধরিয়ে দেন। এবার সবাইকে বলেন প্রথম গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করতে এবং গ্রামের সীমানার বাইরে কোন দিকে কি আছে তা স্পষ্ট করে লিখতে। এরপর গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রধান রাস্তা, শাখা রাস্তা ও উপশাখা রাস্তা গুলিকে আঁকতে বলেন। এখন রাস্তার কোন দিকে কটি করে বাড়ি, কুঁয়ো, নলকূপ, পুকুর, ধর্মস্থান আছে ইত্যাদি গুলিকে অংকন ও চিহ্নিত করতে বলেন। এখন স্বীকার সাধারণের

শিক্ষার স্থান, সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যাদের বাড়ি, দরিদ্রতম পরিবার এবং পুরুষ বিহীন মহিলা নির্ভর বাড়ি গুলিকে চিহ্নিত করতে বলেন। এরপর বনজ সম্পদের স্থান, কৃষি জমি, পাড়ার দোকান ঘর, নদী, খাল, কুটির শিল্পের স্থান ইত্যাদি গুলিকে চিহ্নিত ও অঙ্কন করতে বলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্কেচপেন ব্যবহার করতে অঙ্কন কারীদের উদ্বুদ্ধ করেন।

এরপর গবেষিকা গ্রামবাসীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবার গুলির আর্থিক উপার্জনের উৎস, জমির উৎপাদন চিত্র, যুবক যুবতীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান থেকে অকালে ঝরে পড়ার প্রবণতা, উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ নারীর সংখ্যা, শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উচ্চশিক্ষা লাভের সমস্যা, শিক্ষার্থীদের সমস্যা, দারিদ্র্যা দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি, দারিদ্র্য দূরীকরণে কোন কোন ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা এই এলাকায় কার্যকর হবে, পানীয় জলের সমস্যা, পয়ঃ প্রণালীগত ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা ও তার গুণগতমান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন। এই পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ও কোন কোন গ্রামবাসীর মধ্যে নেতৃত্ব দানের গুণাবলী রয়েছে, সম্পদ পরিমাপনের চিত্র অংকনে কারা অধিক আগ্রহী, এবং সক্রিয় তা বোঝার চেষ্টা করেন। সমস্যার সমাধান বিষয়ে আলোচনাকালে কোন কোন গ্রামবাসী নমনীয়তার সঙ্গে বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন, কাদের ভাবনার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে এবং কারা দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে আগ্রহী অর্থাৎ সৃজনশীলতার গুণাবলী কাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে স্পষ্ট তাও গবেষিকা জানার চেষ্টা করেছেন।

৪.৩.৩ ফোকাস দল আলোচনা বা Focus Group Discussion :-

যেহেতু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষিত এখানে মূল আলোচ্য বিষয় তাই গবেষিকা যে কুড়িটি গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেখানে উপস্থিত সমস্ত সাঁওতাল পুরুষ মহিলাকে প্রথমেই তার গবেষণার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে গবেষিকার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কৌশল এবং পূর্বতন প্রশিক্ষণকে ব্যবহার করে আলোচনাটিকে পরিচালিত হতে দিয়েছেন। এখানে গবেষিকা পূর্বেই একটি খসড়া দিক-নির্দেশনায় তৈরি করে দিয়েছেন,অন্যথায় গবেষণা কর্ম কার্যকর করতে তার অসুবিধা হত। আলোচনার অধিবেশন পরিচালনায় গবেষিকা প্রথমেই উপস্থিত আলোচকদের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাদের সকলকে সাদরে এই আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করেছিলেন। প্রথমে হালকা বিষয় দিয়ে আলোচনা শুরু করে ক্রমশ আরও গভীরে আলোচনাটিকে ধীরে ধীরে গবেষিকা এগিয়ে নিয়ে যান এবং আলোচকদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য উপস্থাপন করতে সহায়তা করেন।

আলোচনায় যে সকল তথ্য উঠে আসে গবেষিকা তার কিছু তথ্যকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেন। যথাযথ মূল্যায়নের পর গবেষিকা প্রক্রিয়াজাত তথ্যগুলিকে আলোচকদের সামনে উপস্থাপন করেন, এবং তার যথার্থতা স্বীকৃত হলে অবশেষে আলোচনার চূড়ান্ত রূপ তৈরি করেন।

৪.৩.৪ সাক্ষাৎকার:

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা দলগতভাবে সংগঠিত এবং অসংগঠিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কালে তিনি সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন,এবং সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে গ্রামের মানুষদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেন। তাদের নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করেন সরাসরি তথ্য গ্রহণের জন্য এবং অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় এমনও কিছু প্রশ্ন করেন যাতে সাক্ষাতদানকারীরা বুঝতে পারেন যে তাদের কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করা হচ্ছে।

পঞ্চম-অধ্যায়ঃ সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ

৫.১ তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের বিশ্লেষণ:

❖ নলবনা, গড়বেতা-৩: -

- **সংস্কৃতি:** - এই গ্রামে চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ সবাই করতে পারে। সব ছেলেরাই ধামসা মাদল বাজাতে পারে। সব মেয়েরাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান করতে পারে, নতুন প্রজন্ম গান শেখার এবং করার চেষ্টা করে। বেশিরভাগ ছেলেরা দূরে মেলা দেখতে যায় রাতে। এই মেলাতে গিয়ে পছন্দের মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে এসে বিয়ে করার রীতি আছে। সাঁওতালদের যতরকম পুজো আছে সব পুজো এই গ্রামের জাহের থানে হয়। এই গ্রামে অ-আদিবাসীদের সাথে ছেলেমেয়েদের বিবাহের ঘটনা নেই এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ করার আগ্রহও নেই। অন্যান্য জাতিদের পুজো পার্বণে এরা অংশগ্রহণ করে।
- **শিক্ষা:** - এই গ্রামে প্রায় ১৫ জন মতো স্কুল ছুট হয়েছে হাইস্কুলে, এবং প্রতিটি স্কুলছুটের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যাই মূল কারণ হিসাবে লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে একটি মেয়ে কলেজে পড়ে। ছেলেদের থেকে মেয়েদের পড়াশোনা করার আগ্রহ বেশি। বর্তমানে তিনটি ছেলে হোস্টেলে পড়াশোনা করছে। অঙ্গনওয়াড়ি গ্রামের কাছে হলেও প্রাইমারি এবং হাই স্কুল একটু দূরে।
- **অর্থনীতি:** - এই গ্রামে দুজন চাকরি করে। একজন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আর একজন সেনাবাহিনীতে। গ্রামের প্রায় সবারই চাষের জমি আছে। বৃষ্টি না হলে ধান বা সবজি চাষ

হয় না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি অনেকে পায়নি। গ্রামের মানুষের প্রধান কাজ হল জ্বালানি কাঠ,পাতা বিক্রি করা। বেশির ভাগ মানুষ দিনমজুরির কাজ করেন।

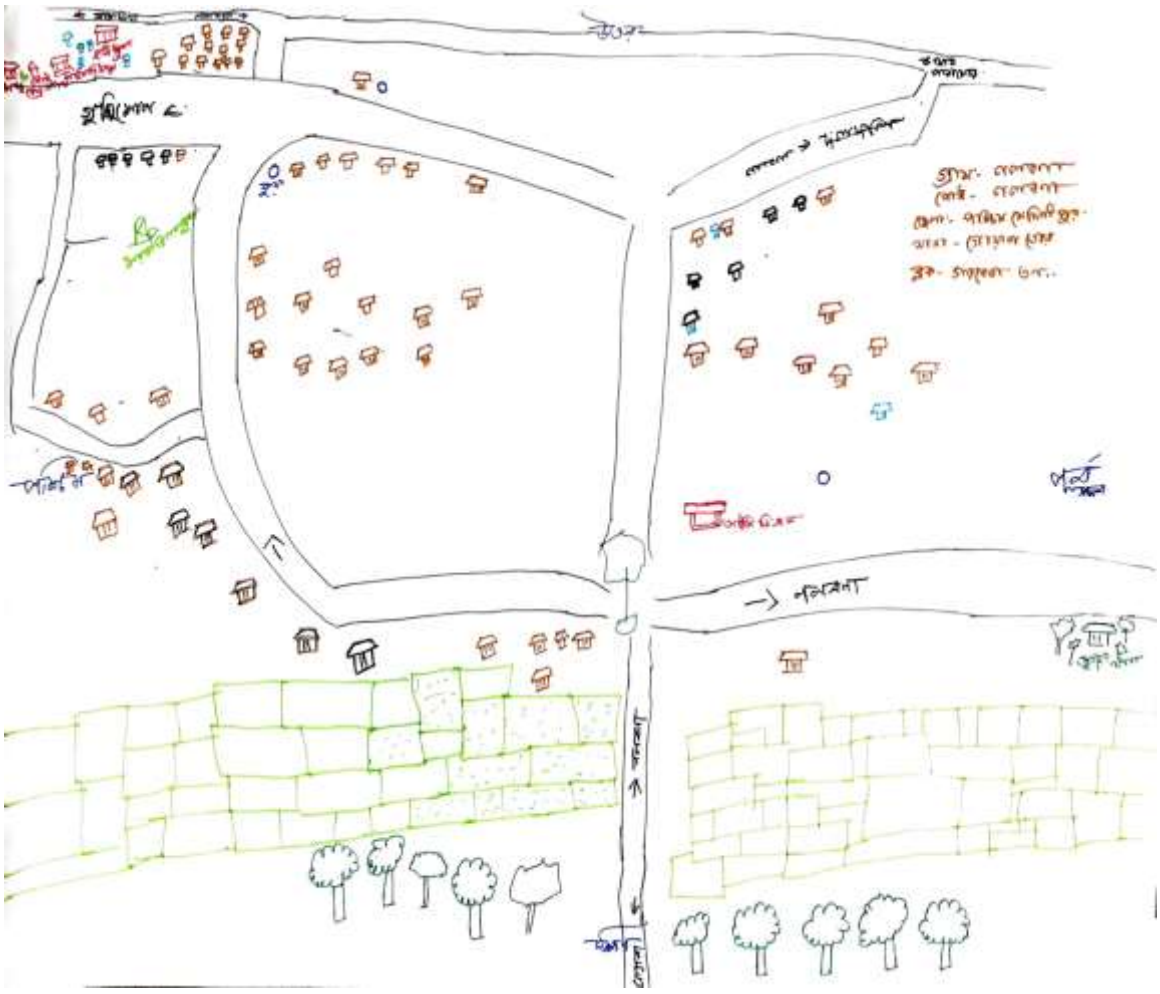

কাঠবেড়ালী, খরগোশ, ইঁদুর, গোসাপ, পভৃতি তারা খাদ্য হিসাবে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে থাকে। জঙ্গলে যে গাছগুলো পড়ে যায় এবং বাঁকা সেই গাছগুলোই গ্রামের মানুষ কাটে। প্রায় অধিকাংশ যুবকরা নেশাগ্রস্ত। জঙ্গলে শাল, মহুল, কেঁদ, পিয়াল, হরিতকী, চাপাতি, কুল, খেজুর, কুসুম গাছ আছে। জঙ্গল বাঁচাও কমিটি আছে। জঙ্গলকে সবাই রক্ষা করতে চায়। রেশন সবাই ঠিকঠাক পাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানে না। সরকার থেকে দেওয়া জলের সুবিধা পায়। গ্রামের মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত।

❖ কামারবান্ধি, ঝাঁকড়া, চন্দ্রকোনা-২

❖ **সংস্কৃতি :-** গ্রামের সবপুজোতেই সবাই অংশগ্রহণ করে। সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ করতে পারে। পুরনো প্রজন্ম সাংস্কৃতিক গান জানলেও বর্তমান প্রজন্ম সাংস্কৃতিক গান শেখেনি। গ্রামে ধামসা মাদল থাকার কারণে সবাই বাজাতে শিখেছে। এই গ্রামে অন্য জাতিতে বিবাহ নেই, অন্য জাতিতে বিয়ে না করার জন্য গ্রাম থেকে কড়া নিয়ম করা হয়েছে। তবে অন্য জাতিতে বিয়ে করার ব্যাপারে ধীরে ধীরে মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলেরা প্রচুর পরিমাণে পাতা পরবে ঘোরে। এই গ্রামের ছেলেরা প্রেম করে বিয়ে করেছে কিন্তু মেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করেনি। যারা প্রেম করে বিয়ে করেছে তারা অল্প বয়সে বিয়ে করে ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপুষ্ট বাচ্চার জন্ম হয়।

❖ **শিক্ষা:** - এই গ্রামে শিক্ষার হার খুবই কম। প্রায় ৬৮ জন স্কুলছুট আছে। স্কুল ছুট হওয়ার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং খেলাধুলার জন্য পড়াশোনা হয় না বলেই গ্রামের মানুষের ধারণা। এই গ্রামে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে স্নাতক স্তরের পড়া সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মিড ডে মিলের সমস্যা আছে, খাবার মান ভালো নয়। বর্তমানে চাকরির অবস্থা বেহাল বলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় আগ্রহ পাচ্ছে না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি।

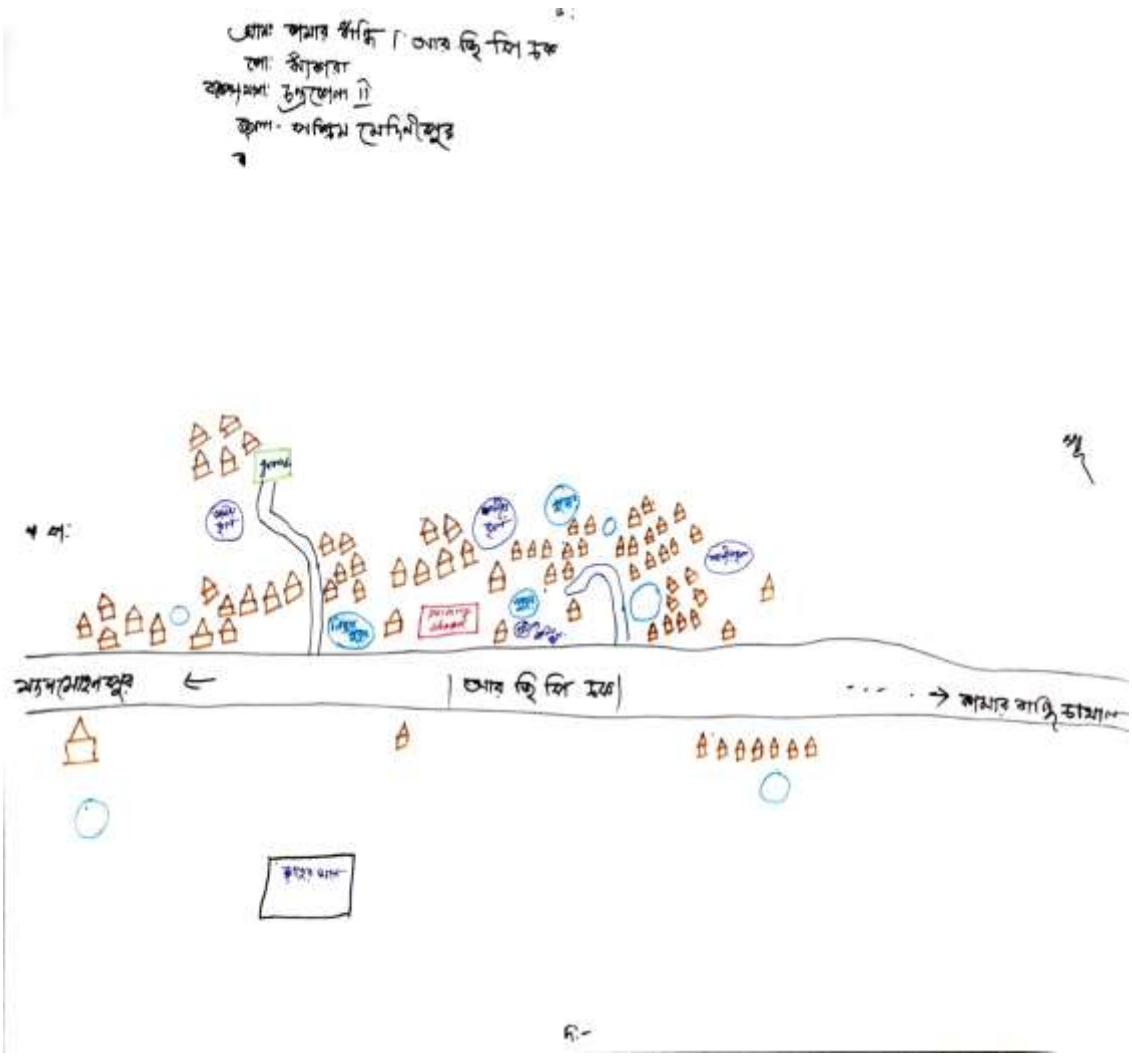

❖ **অর্থনীতি:** - এই গ্রামের সবারই কমবেশি চাষের জমি আছে, এই জমিগুলোতে ধান এবং আলু চাষ হয়। অসুখ-বিসুখ হলে এরা ডাক্তার দেখায় এবং প্রাচীন পদ্ধতিও অবলম্বন করে। যে কোন অনুষ্ঠানে বাড়িতে হাঁড়িয়া এবং মদ তৈরি করা হয়। বয়স্করা মদ, হাঁড়িয়া খায় এবং তার সাথে নতুন প্রজন্মও খাওয়া শুরু করেছে। ১৫ টি পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছে। সবাই রেশন ঠিকঠাক পায়, কেউ পুরোহিত ভাতা পায়না। বেশিরভাগ মানুষ দিনমজুরের কাজ করে। গ্রামে একজনের ভূষিমাল দোকান এবং একজনের পান দোকান আছে। বর্তমানে এই গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারেরই সঞ্চয়ী মনোভাব আছে।

❖ **গগনাশুলি: -**

- **সংস্কৃতি:-** এই গ্রামের মানুষ সাঁওতালি ভাষায় সবাই কথা বলতে জানেন। বিধবা বা বয়স্করা গান করতে জানলেও নতুন প্রজন্মের মেয়েরা গান করতে জানে না। মেয়েরা সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে জানে এবং চিরাচরিত সাংস্কৃতিক বাজনা বাজাতে সব ছেলেরাই জানে।
- **শিক্ষা: -** এই গ্রামে ভাষাগত কোন সমস্যা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই গ্রামে কোন ড্রপ আউট নেই কমপক্ষে কলেজ পর্যন্ত সবাই পড়াশোনা করেছে এবং প্রায় সবাই চাকুরীরত অথবা কোনো কাজের সাথে যুক্ত।

- **অর্থনীতি:** - কমবেশি সবাই চাকুরীরত এবং শিক্ষিত হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত। জঙ্গলের কাঠ সাধারণত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জঙ্গলের উপর সেরকম ভাবে নির্ভরশীল নয় কিন্তু জঙ্গলকে তারা রক্ষা করে থাকে। কয়েকজন গ্রামবাসী চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তারা পায়। সরকারি স্কিম সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন।

❖ কুড়চিবনী (নয়াগ্রাম): -

- **সংস্কৃতি:** – নতুন প্রজন্মের সবাই বাজনা বাজাতে জানেনা এবং শেখার চেষ্টাও নেই। ডিজে ব্যবহার হয় না। পরবে গিয়ে বিয়ে করার চল আছে। পুজোতে বা অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির পোষাক পরে। অন্যজাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে। জাতিভেদ প্রথা নেই। কম বয়সে এবং অন্য জাতিতে বিয়ে করে না।
- **শিক্ষা:** – ছেলেমেয়ে সবাই স্কুলে যায়। ২ জন মেয়ে একজন ছেলে কলেজ পাশ করেছে। ৩ জন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। অঙ্গণ ওয়াড়িতে মিডডে মিল বন্ধ থাকে মাঝে মাঝে।
- **অর্থনীতি:** – সরকার থেকে ৩০ টি বাড়ি ও বাথরুম পেয়েছে। সবার চাষের জমি নেই, ২ বার ধান চাষ হয়। দিনমজুরের সংখ্যা বেশি। সিভিক পুলিশ মিলিয়ে চারজন চাকরি করে। সরকারি নলকূপ থাকলেও তাতে খাবারের জলের সমস্যা মেটেনি।

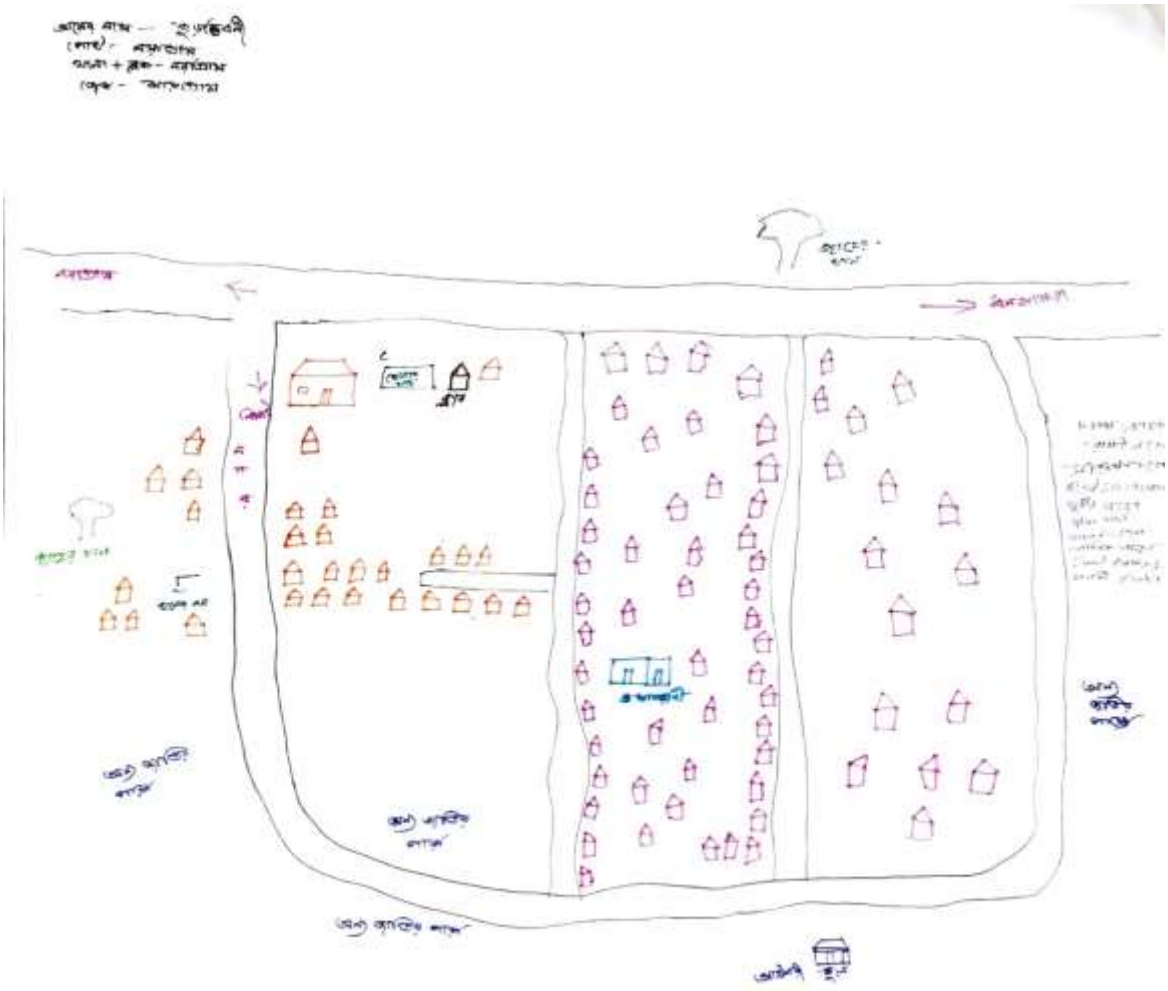

অনেকেই জঙ্গলে পাতা তুলতে যায়, জ্বালানি নিয়ে আসে। অনেকেরই পাতা বিক্রি করে সংসার চলে। শাল, মহুল, কেঁদ, বহেড়া গাছ পাওয়া যায়। জঙ্গলে ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, খরগোস, বনবিড়াল আছে। বছরে একবার শিকার পরবের সময় জঙ্গলে শিকার করতে যায়।

ষষ্ঠ-অধ্যায়: প্রাপ্ত ফলাফল ও তার আলোচনা

৬.১ প্রাপ্ত ফলাফল (Findings):

গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের কুড়িটি আদিবাসী (সাঁওতাল) গ্রাম থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান চিত্র তিনি এই গবেষণায় দেখার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়োজনে তিনি প্রতিটি গ্রামে নিজে গিয়েছেন, কিছুদিন থেকেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। PRA, FGD এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে যে তথ্য পেয়েছেন সেগুলিকে নীচে তুলে ধরা হলো-

৬.১.১ সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. সমস্ত গ্রামেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান।

খ. কোন অবস্থাতেই সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন।

গ. বর্তমান প্রজন্মের সাঁওতাল ছেলেমেয়েরাও চিরাচরিত সাঁওতালি সংস্কৃতি মেনে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করে এবং বিয়ে করতে পছন্দ করে।

ঘ. সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থাকে এখনও বর্তমান প্রজন্ম যথেষ্ট সম্মান দিয়ে থাকে।

ঙ. সাঁওতালদের নিজস্ব সারি-সারনা ধর্মকে সকলেই শ্রদ্ধা করে এবং কেউই অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চায় না। সমস্ত সাঁওতাল গ্রামেই নিজেদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষায় কথোপকথন চলে।

চ. পুরানো প্রজন্মের মতো বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরাও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে ভালোবাসে।

ছ. পুরনো প্রজন্মের মহিলারা চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী গান করতে জানলেও নতুন প্রজন্মের মেয়েরা চিরাচরিত গান শিখতে পারেনি। কিন্তু তারা এই গান শিখতে আগ্রহী।

জ. পুরনো প্রজন্ম এবং নতুন প্রজন্মের সমস্ত মহিলা ও মেয়েরা তাদের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে পারে।

ঝ. সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী বাজনা পুরানো প্রজন্মের পুরুষদের সাথে সাথে নতুন প্রজন্মের ছেলেরাও শিখতে আগ্রহী। বেশিরভাগ গ্রামেই নতুন প্রজন্মের ছেলেরা তা আয়ত্তও করতে পেরেছে।

ঞ. সমস্ত গ্রামগুলিতেই ছেলেদের পরবে গিয়ে কম বয়সে পালিয়ে বিয়ে করার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে।

ট. ডেবরা, পিংলা, শালবনি, সবং, গোহালউড়া, বেগমপুর, কলকলি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহের ঘটনা আছে। যদিও বয়স্করা এই ধরনের বিয়েকে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না।

ঠ. গড়বেতা-২ ব্লকের বুলানপুর গ্রামে চারটি সাঁওতাল পরিবার খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।

ড. সব গ্রামেই সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনী প্রথায় বিশ্বাস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

ঢ. সব গ্রামেই সাঁওতালরা তাদের সমস্ত পুজো জাহের থানেই করে।

ণ. প্রায় সব গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরাই অন্য জাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে।

ত. চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ-গানের প্রচলন থাকলেও বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ডিজে বাজিয়ে নাচ করার প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

থ. সব গ্রামে যেকোন অনুষ্ঠানে মদ হাঁড়িয়া তৈরি করা এবং খাওয়ার চল রয়েছে।

দ. যে গ্রামগুলিতে ছেলেমেয়েরা অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ করেছে, তাদের বেশিরভাগ গ্রামেই এক ঘরে করার প্রবণতা নেই।

ধ. বয়স্ক এবং নিরক্ষর পুরুষ ও মহিলাদের কেউ কেউ ‘ডাইনি’, অপদেবতা, ভুত-প্রেত, ওঝা-গুনিন বিষয়ে বিশ্বাস রাখে।

ন. এদের মধ্যে পরিযায়ী হওয়ার বা স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প. সাঁওতাল পরিবারগুলিতেও বিশ্বায়ন এবং আধুনিকীকরণের ঢেউ লেগেছে

৬.১.২ সাঁওতালদের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. অর্থনৈতিকভাবে সাঁওতালরা পূর্বের তুলনায় একটু ভালো অবস্থানে বর্তমানে থাকলেও অধিকাংশ গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবার এখনো দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

খ. কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা থাকলেও, আজও পর্যন্ত তার সুফল অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামের সাঁওতাল পরিবারগুলিতে পৌঁছায়নি।

গ. বহু পরিবারে এখনো পর্যন্ত আধার কার্ড এমনকি কিছু ক্ষেত্রে রেশন কার্ডও নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই সরকারি রেশন বা অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে সাঁওতালদের অনেকেই বঞ্চিত।

ঘ. অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবারে কোনো সদস্য/সদস্যা সরকারি/বেসরকারি চাকরি ক্ষেত্রে নিযুক্তি লাভ করেন নি।

ঙ. প্রায় কোন গ্রামেই কোন সাঁওতাল পুরুষ বা মহিলা কোন ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নয় তবে ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ সবজি বা মসলার স্থানীয় ব্যবসা করেন।

চ. মেদিনীপুর জেলার কিছু ব্লকে এবং ঝাড়গ্রাম জেলার অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামে চাষযোগ্য জমিতে কেবলমাত্র আমন ধানের চাষ হয়। কারণ ওই সকল জমিতে কোনরূপ সেচের ব্যবস্থা নেই। ওই জমিগুলিতে চাষ করার জন্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করতে হয়।

ছ. সাঁওতাল গ্রামগুলিতে অধিকাংশ বাড়িতেই শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই।

জ. বহু সাঁওতাল পরিবারই এখনো কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে।

ঝ. ঝাড়গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতাল পাড়া যেহেতু জঙ্গলের কাছে তাই অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য তারা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

ঞ. এখনো অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবার অর্থনৈতিকভাবে দিনমজুরীর উপর নির্ভরশীল।

ট. বহু সাঁওতাল পরিবার পরিযায়ী শ্রমিক রূপে দূর দূরান্তে ইঁটভাটা, রাস্তা তৈরি, চাষের কাজ, মুরগী ফার্মে ডিম কুড়ানো ইত্যাদিতে শ্রম দান করে।

ঠ. সাঁওতালরা তাদের ছোটখাটো অসুখে জঙ্গলের ঔষধি গাছ ব্যবহার করে।

ড. সাঁওতালরা গেঁড়ি, গুগলি, শাকপাতা, জঙ্গলের বিভিন্ন গাছের মূল,মাশরুম এবং জঙ্গলে শিকার করা পশুর মাংস প্রভৃতি দিয়ে নিজেদের ভিটামিন-প্রোটিনের চাহিদা মেটায়।

৬.১.৩ সাঁওতালদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. বর্তমান প্রজন্মের সমস্ত ছেলেমেয়েরাই বিদ্যালয়ে যায়।

খ. বর্তমানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা পড়াশোনা করতে বেশি আগ্রহী।

গ. বনবাসী আশ্রমিক বিদ্যালয় কোন গ্রামে নেই।

ঘ. প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি গ্রামের কাছাকাছি থাকলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ বহুদূরে থাকায় সাঁওতাল পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে অপারগ।

ঙ. বাবা মায়ের দূরদর্শিতার অভাব, কাজের চাপ, দরিদ্র্য, জঙ্গলে-মাঠে ছেলেমেয়েদের ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা, শিকারের প্রতি আসক্তি, বিভিন্ন সময়ে সামাজিক অনুষ্ঠান ও পরবে অংশগ্রহণ, ফুটবল খেলায় আসক্তি, কম বয়সে বিয়ে ইত্যাদির কারণে অধিকাংশ সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে এখনো উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হতে পারেনি।

চ. যেহেতু উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের পক্ষে সরকারি বা বেসরকারি চাকরি সংগ্রহ সহজসাধ্য নয় তাই গ্রামের মানুষরা সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় পাঠাতে অনাগ্রহী।

ছ. অধিকাংশ এলাকায় প্রাথমিক থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত কোন স্কুল নেই। সাঁওতালি ভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ নেই, ফলে বাংলা ভাষায় পড়তে অনাগ্রহী বহু ছেলে মেয়ে প্রাথমিক স্তরেই বিদ্যালয় ছুট হয়ে যায়।

জ. সমস্ত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা থাকলেও শুধুমাত্র খাবারের টানে সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় না।

ঝ. অল্প কিছু সংখ্যক সাঁওতাল গ্রামে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও এখনো পর্যন্ত এটি কোন সামগ্রিক চিত্র নয়।

ঞ. মধ্যাহ্ন কালীন আহার গ্রহণের সময়, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা আদিবাসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে আহার এবং খেলাধুলা করতে আগ্রহ দেখায় না।

ট. সাঁওতালি ভাষা ও সাঁওতালি সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং সাঁওতালি সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান শিক্ষক/শিক্ষিকার অনুপস্থিতির কারণে সাঁওতাল ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে এমনকি উচ্চ শিক্ষার প্রাঙ্গনেও হীনমন্যতায় ভোগে যার ফলে অচিরেই তারা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ঠ. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষার পরিমন্ডল আজও অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

ড. পৃথকভাবে 'মহিলা মঙ্গল সমিতি' কোন গ্রামেই তৈরি হয়নি এ বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারি কোনো উদ্যোগ আজও চোখে পড়েনি।

৬.২ আলোচনা (Discussion):

বর্তমান গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার যে কুড়িটি গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে সাঁওতাল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা তিনি সাঁওতাল মানুষ জনের মধ্যে লক্ষ্য করেননি। তবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে উচ্চশিক্ষায় আসা বহু সাঁওতাল যুবক-যুবতী আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর উচ্চবর্ণের ছেলে/মেয়েকে বিবাহ করেছেন এবং নিজের গ্রাম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না যাওয়ার বিষয়ে মনস্থ করেছেন। এদিক থেকে দেখলে গ্রামীণ সাঁওতাল সমাজ মনে করেন উচ্চশিক্ষা তাদের সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ যে শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর ছেলে-মেয়েরা সমাজ-সংস্কৃতি, প্রথা, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস না রেখে অন্য ধর্ম, অন্য সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ধাবিত হয়, তা যে কোনো সমাজের পক্ষে মৃত্যু ব্যতীত কিছু নয়। বর্তমান গবেষিকাও বিশ্বাস করেন যে সাঁওতাল সমাজের উন্নতির জন্য

উচ্চশিক্ষা লাভ করা জরুরী। কিন্তু একই সাথে নিজের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় পরিচিতি কে অস্বীকার করে নয়।

সাঁওতাল সমাজে মেয়েরা চিরাচরিতভাবেই যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন। যদিও সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ছেলেদের তুলনায় সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের অধিক পরিমাণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতাল মেয়েরা এখন শুধুমাত্র শালপাতা, সাবুই ঘাস ইত্যাদি শিল্পে নিজেদের বন্দী না রেখে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ, রূপচর্চা, অফিস সহকারী, রেস্টুরেন্ট সহকারী, স্বাস্থ্য সহায়িকা, শিক্ষিকা, ক্লার্ক ইত্যাদি বৃত্তিতে আগ্রহী হয়েছেন। তবে যে সমস্ত মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তারা উচ্চশিক্ষায় আর অধিক অগ্রসর হতে পারছেন না। গ্রামীণ এলাকায় সাঁওতাল মেয়ে এবং মহিলারা সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ তৈরি করে তার মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক সামর্থ্যকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। এখন সাঁওতাল মেয়েরা বুঝেছেন টাকা সঞ্চয় করার গুরুত্ব। তাই পঞ্চায়েত থেকে তাঁদের দক্ষতা বিকাশকারী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক পরিসরেও শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের আগ্রহ এবং উপস্থিতি চোখে পড়ছে। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতিও একজন সাঁওতাল মহিলা। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিতা সাঁওতাল মেয়েদের সাথে আলোচনা করে এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

সমাজ-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাঁওতাল সমাজে বিশেষ কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা না গেলেও সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার এবং স্বশক্তিকরণ এর আকাঙ্খায় এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। সাঁওতাল সমাজের যুবক-যুবতীরা

উচ্চশিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহী। চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা এবং বিভিন্ন সরকারি চাকুরী ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা বিশেষ ভাবে এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বায়ন এবং আধুনিকীকরণ সাঁওতাল সমাজকে স্পর্শ করেছে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। বিশ্বায়ন সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক চিত্রকে পরিবর্তিত করেছে। শতকরা ৬৫.৫ ভাগ সাঁওতাল বর্তমানে ভালো উপার্জন করেন, ১৫.৫% সাঁওতাল মধ্যম মানের উপার্জন করেন এবং ৯% সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ স্বল্প মানের উপার্জন করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপরে অরূপ দে (২০১৫) এর গবেষণায় এই তথ্য ধরা পড়েছে। এই বিশ্বায়নের কারণে সাঁওতালদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন শতকরা ৫৩.৫ ভাগ সাঁওতাল পুরুষ ও মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে আগ্রহী কারণ তাদের বিশ্বাস আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাল মেলাতে গেলে উচ্চশিক্ষা লাভ জরুরী। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুযোগ পেলে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহ অধিক। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার যেখানে ৬৬.১২% ছিল সেখানে সাঁওতাল মেয়েদের ওই সময় সাক্ষরতার হার ছিল ৪৩.৫% এবং সামগ্রিকভাবে এই সাক্ষরতার হার ছিল ৬৬.১২%। বর্তমানে এই হার বৃদ্ধির প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষণীয়। তাই সাঁওতাল পরিবার উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য তাদের ছেলেমেয়েদের দূরের স্কুল-কলেজের হোস্টেলে রাখতে আর দ্বিধাবোধ করেন না। তবে একথাও ঠিক যে সামগ্রিকভাবে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট না থাকায় উচ্চশিক্ষিত/শিক্ষিতা সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চশিক্ষা লাভের ফলে এরা আর চিরাচরিত শারীরিক শ্রমের কাজে অংশ

নিতে পারছেন না। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক যুবতীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট হতাশা জেগেছে।

গবেষিকা তাঁর গবেষণায় লক্ষ্য করেছেন যে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় শিক্ষাটুকুই শেষ করতে পারেনা। প্রাথমিক শিক্ষা শেষের আগেই অনেকে স্কুলছুট হয়ে যায়। অন্তত মাধ্যমিক শ্রেণি অবধি ধারাবাহিক শিক্ষা লাভ না করলে অধীত বিদ্যা এরা ধরে রাখতে পারে না। ফলে পূর্বতন শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কারণ হিসাবে জানা গেছে পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ভাষাগত সমস্যা, বাড়িতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করার মতো লোকের অভাব, সহপাঠীদের বঞ্চনা এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে পৃথকীকৃত থাকা, পারিবারিক কাজকর্মে নিযুক্তি ইত্যাদির কারণে এরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করতে পারেনা। বর্তমান গবেষিকার প্রাপ্ত ফলাফল কে স্বীকার করেছেন বিভিন্ন গবেষক- মুরমু, দে এবং মাইতি (২০২০), গৌতম (২০০৩) প্রমুখরা।

সরকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বনির্ভরতার পাঠদানের লক্ষ্যে Large Sized Multipurpose Cooperative Society (LAMPS) তৈরি করে আর্থিক ঋণদান, উন্নতমানের বীজ, সার, ওষুধ, চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এছাড়াও আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আদিবাসী এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে অধিক সংখ্যক আদিবাসী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আদিবাসী ছেলেরা যাতে সরকারি চাকুরীতে ঢুকতে পারেন তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৬.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য:

বর্তমান শিক্ষাক্ষেকে গবেষিকার গবেষণাটি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে-

১. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করা এবং পুরো শিক্ষার সময়কাল তাদেরকে ধরে রাখার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকারা বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের এই সমস্ত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা ভাষাগত সমস্যা, সঞ্চিত শব্দভাণ্ডারের অপ্রতুলতা এবং পরিবারে শিক্ষার্থীর বিষয় ভিত্তিক সহায়তা দানের সুযোগ না থাকার জন্য এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় ছুট হয়ে যায় তাই এদের জন্য অবসর সময়ে অতিরিক্ত সহায়তা দানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২. অর্থনৈতিকভাবে এই পরিবারগুলি পিছিয়ে থাকে। এদের অধিকাংশের যথেষ্ট পরিমাণে চাষযোগ্য জমি নেই। যে অল্প জমি রয়েছে তাতে বর্ষার জল ভিত্তিক চাষটুকু হয়। এই সকল দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সারা বছরের প্রয়োজনীয় বই, খাতা, পেন, পেন্সিল, রং, দুই সেট করে ইউনিফর্ম, জুতা, ছাতা, জলের বোতল সমস্ত বিদ্যালয়ে থেকে এদের সরবরাহ করতে হবে। দারিদ্র্যের কারণে অনেক পরিবারে দিনান্তে একবার মাত্র রান্না হয় এবং খাবার জোটে, তাই বহু ছেলে-মেয়ে সকালে অভূক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসায় লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারেনা। তাই মধ্যাহ্নকালীন আহারের দিকে তাদের নজর থাকে। বিদ্যালয়ের শুরুতেই যদি এদের জন্য ভারী টিফিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে একদিকে যেমন এরা পুষ্টি লাভ করবে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার প্রতি এদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে অবশ্যই। অভুক্ত শরীরে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ যে অসম্ভব এ কথা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরাও জানতেন।

৩. ভাষাগত সমস্যার কারণে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বহু শিক্ষার্থী তাদের প্রার্থিত শিক্ষাটুকু লাভ করতে পারে না, তাই সাঁওতালি ভাষায় পাঠদানের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সকল এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীর আধিক্য রয়েছে সেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের অধিকাংশ সংখ্যায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করলে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

৪. আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে আরো গভীরভাবে নিরন্তর গবেষণার প্রয়োজন। সরকারি প্রচেষ্টা এবং সাহায্য ব্যতিরেকে দীর্ঘমেয়াদি গুণগত মান বিশিষ্ট গবেষণা অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেও আদিবাসী বিষয়ের গবেষণায় আগ্রহ দেখাতে হবে এবং গবেষকদের বিশেষ ভাবে আর্থিক সহায়তা দান ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এবং আদিবাসীদের সম্পর্কে উন্নত গুণমানের গবেষণা গুলিকে প্রকাশিত করতে হবে। অন্যথায় আদিবাসী বিষয়ে গবেষণার সুফল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে পৌঁছাবে না।

৬. সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আদিবাসীদের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পত্র যুক্ত রাখতে পারলে ভাবী কালের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা আদিবাসীদের সমস্যা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ জানবেন। এই সমস্ত শিক্ষকরা তবেই শ্রেণীতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পর্যায় গুলি গ্রহণ করতে পারবেন।

৬.৪ পরবর্তী গবেষণার সুযোগ:

১. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য পাঠক্রম এর মধ্যে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক কাহিনীকে কিভাবে যুক্ত করা যায় এবং তুলে ধরা যায় সে বিষয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

২. আদিবাসী বয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা, তাদের জন্য পাঠাগার প্রস্তুতকরণ বিষয়েও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

৩. বনজ সম্পদকে সুরক্ষিত রেখে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে কিভাবে সেগুলিকে সুরক্ষিত রাখা যায় এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. আদিবাসীদের জন্য এলাকাভিত্তিক এবং সম্পদের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে নতুন ধরনের কি কি বৃদ্ধিতে এদের নিযুক্ত করা যায় ও আর্থিকভাবে এদের সাফল্যের মুখ দেখানো যায় সেই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৫. বর্তমানের বিশ্বায়ন, পাশ্চাত্যীকরণ এবং আধুনিকীকরণের প্রভাব সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপর কতখানি এই নিয়ে গবেষণা করা যায়।

৬. আদিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং ডাইনি প্রথা, মন্ত্র, ভূত-প্রেত, ওঝা-গুনিন ইত্যাদি থেকে মুক্ত করবার জন্য এবং এদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

৬.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

১. গবেষিকা কেবলমাত্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করেছেন। তিনি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের তুলনামূলক আলোচনাতে প্রবেশ করেননি।

২. তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা দানের জন্য গবেষিকা কেবলমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে মাত্র কুড়িটি গ্রাম চিহ্নিত করে কাজ করেছেন। ফলে অপরাপর গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ না করায় এই গবেষণায় সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বিষয়ে বহু তথ্যই গবেষিকার জানার বাইরে থেকে গেছে।

৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষিকা কেবলমাত্র দুটি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামকে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। সময়ের অভাব, অর্থাভাব, যোগাযোগের ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে অন্যান্য জেলাগুলি থেকে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি।

৪. আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষত সাঁওতালদের নিয়ে প্রচুর গবেষণা না হওয়ায় গবেষিকা খুব বেশি সংখ্যক গবেষণা পত্রের পর্যালোচনা করে উঠতে পারেননি।

৫. উপযুক্ত সহায়ক ব্যবস্থা না থাকার কারণে গবেষিকা আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ কালে যে কৌশল গুলিকে ব্যবহার করেছেন তার বিস্তারিত স্থিরচিত্র এবং অডিও ভিসুয়াল চিত্র সংগ্রহ করতে পারেননি।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

Ahmed, N., & Tattwasarananda, S. (2018). Education of Santals of Jhargram: An Ethnographic Study. *IOSR-JHSS*, 7(3), 51-58.

Ahmed, N., & Tattwasarananda, S. (2019). Mordenization and the Educated and Non-Educated Santals of Jhargram: An Ethnographic Study. *JETIR*, 6(5), 180-200.

Ali, S., & Akter, T. (2014-2015). Gender Development and the Status of Tribal Women: A Study of Tripura. *A Journal on Tribal life and Culture*, 18 (2), 86-93.

Sen, Amartya (2020, Feb). Forward. Living World of the Adivasi of West Bengal. *Asiatic Society and Pratichi Institute.*

Anbuselvi, G., & Leeson, P. G. (2017). Education of Tribal Children in India: A Case Study. *IJAIR,* 4 (3), 205-209.

Babu, T. B., & Brahmanandam, T. (2016). Educational Status among the Schedule Tribes Issue and Challenges. *NEHU,* 14(2), 69-85.

Banerjee, S., & Adhikary, B. (2017). Multiculturalism and Academic Libraries: A case study of Santal Tribe of West Bengal, India. *NSOU*, 4(1), 36-44.

Basu, A., & Chatterjee, S. (2013). Status of Educational Performance of Tribal Students Study in Paschim Medinipur District, West Bengal, *S-Academic Journal*, 9 (20), 925-937.

Biswas, S., & Chatterjee, M. (2018). Folklores of Shantal Inhabiting Joypur Forest of Bankura District, West Bengal. *RJLBPCS*, 4 (6), 780-788.

Buzdar, M. A., & Ali, A. (2011). Parent's Attitude toward Daughter's Education in Tribal Area of Dera Ghazi Khan (Pakistan). *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry,* 2 (1), 16-23.

Chakraborty, N, R., & Paul, A. (2014). Traditional Knowledge on Medicinal Plants used by the Tribal People of Birbhum District of West Bengal in India. *IJAEB,* 7 (3), 547-554.

Chakraborty, S. P., Ghosh, J., Bhattacharya., & Panda, S. (2019). Unveiling the Socio-Economic Condition of Tribal Peoples in West Bengal. *International Journal of Operation Research, Technology and Engineering*, 8(4), 12317-12326.

Daripa, S. K. (2018). Social Economic Status of the Tribals of Purulia District in the Post-colonial Period. *International Journal of Research in Social Science,* 8(2), 727-739.

Das, M. (2017). Economic Growth and Women Empowerment through Education: A Study on Santal at Birbhum, West Bengal. *IJEDR,* 5(3), 392-397.

Das, P. (2020). Educational Status and Dropout Rate of Schedule Tribe in West Bengal: Study on Birbhum District. *Aegaeum Journal,* 8 (8), 485-495.

Das, P. (2020). Educational Status and Drop-Out Rate of Scheduled Tribe in West Bengal: A Study on Birbhum District. *AEGAEUM JOURNAL*, 8(8), 485-495.

Das, T. (2019). Economic Condition of Santhal Tribe in Lakhimpur District: A Sociological Study. *EPRA International Journal of Research and Development,* 4(10), 123-125.

Dey, A. (2015). An Ancient History: Ethnographic Study of the santhal, *International Journal of Novel Research in Humanity and Social Science*, 2 (4), 31-38.

Dey, A. (2015). Globalization and Change in Santhal Tribes at Paschim Medinipur (West Bengal), India. *International Journal of Scientific Reesearch,* 4(6), 37-41.

Dutta, S., & Bisai, S. (2020). Literacy Trends and Differences of Schedule Tribe in West Bengal: A Community Level Analysis. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 16(1), 125-132.

Garnaik, I., & Barik, N. (2012). Role of Ashram School in Tribal Education: Study of a Block in Jharsuguda District. *Orisha Review,* 85-89.

Ghosh, P. (2013). Development Programme and the Tribal Study on the Santal of Birbhum District. *IOSR-JAGG*, 1 (5), 35-39.

Ghosh, P. (2015). Impact of Globalization on Tribal World of West Bengal. *Arts and Social-Science Journal*, 6(2), 1-5.

Ghosh, P. (2018). Development of Education and its Impact on the Population Composition of the Tribal People of Birbhum District of West Bengal. *ASSRJ,* 5 (1), 64-82.

Gope, L., Behera, S. K., & Roy, R. (2017). Identification of Indigenous Knowledge Components for Sustainable Development among the Santal Community. *AEGAEUM,* 5(8), 887-893.

Goutam, Vinoba (2003). Education of Tribal Children in India and the Issue of Medium of Instruction, Janasala, Maharashtra, India. *International Journal of Research,* 6 (3), 85.

Guha, N., & Das, P. (2013-14). Educational Advancement of Schedule Tribes in West Bengal (1947-2011). *GJISS*, 18, 112-131.

Guha, S., & Ismail, M.D. (2015). Socio-Cultural Change of Tribes and Their Impacts on Environment with Special Reference to Santhal in West Bengal. *GJISS*, 4(3), 148-156.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Binpur_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Binpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chandrakona_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chandrakona_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Daspur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Debra_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_III

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ghatal_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gopiballavpur_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gopiballavpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jamboni_(community_development_bloc)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keshiari

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keshpur-(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kharagpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nayagram_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pingla_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sabang_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salboni_(community_development_block)

https://www.Banglalectureshеet.xyz/2022/06/Methodology-Focus-Group.html

Majumder, K., & Chatterjee, D. (2021). The cultural dimension of environment: Ethnoscientific study on santal community in eastern India. *IJAE,* 5 (16), 1-21.

Majumder, K., & Chatterjee, D. (2021). The Cultural Dimension of Environment: Ethnoscientific Study on Santhal Community in Eastern India. *International Journal of Antropology and Ethnology,* 5(16), 1-21.

Mal, S., & Khatun, S. (2022). The Status of Women among the Tribal Communities of West Bengal, India, *Research Journal of Humanities and Social Science.*

Mallick, M. A. (2011). Tribal Development Scenario in West Bengal A Study of Jamalpur Block of Burdwan District. *IJSW,* 72(3), 315-334.

Mishra, M. (2014). Educational Awareness of Tribal People (Santali) in Malda District, West Bengal. *IJIFR,* 2(3), 630-639.

Mondal, J. (2018). Socio-Economic Status of Tribal People Mukundapur Village West Bengal. *International Journal of Innovative Science and Research Technology,* 3(12), 354-357.

Mudi, N, R. (2018). Transformation of Social-Economic Condition of Tribal Community in Frontier Bengal: Identity Crisis and Present Scenario. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5 (10), 667-673.

Mukherjee, S. (2014). Ignored Claims: A Focus on Status of Tribal Women Education of Santal community of Purulia District, West Bengal, India. *Transactions*, 5 (1), 43-48.

Mukherjee, S. (2014). Status of Female Education among Santal, kheria Sabar and Birho & Tribal Communities of Purulia District West Bengal, India. *Transactions*, 36 (2), 271-278.

Murmu, De, & Maiti (2020). Problems of Drop-Out of Scheduled Tribe Students at the Upper Primary Level. *International Journal of Research*, 6 (3), 76-85.

Patra, B., & Mal, S. (2020). A Study on Educational Status of Santal (tribal) Community: A Theroitical Study on Gourangdih Gram Panchayat of Purulia (1978-2011). *Journal of Social Science,* 8 (1), 356-359.

Patra, S., & Panigrahi, N. (2018). Educational Status of the Marginalized: A Study among the Santal of Paschim Medinipur District West Bengal. *Journal of Social Science,* 57(1-3), 1-7.

Patra, S., Dutta, A. K., & Upadhyay, P. (2021). An Analysis on the Educational Awareness of Marginalized Community of Nayagram Block, Jhargram District, West Bengal. *NSOU*, 4 (1), 36-44.

Paul, S. K., & Gupta, A. (2016). The Changing Cultural Pattern among the Santals of Birbhum, West Bengal. *South Asian Anthropologist*, 16 (1), 7-18.

Pushpalatha. (2010). The Influence of Globalization Over Tribal Culture, Education and Health in Jharkhand. *The International Journal of Indian Psychology*, 7(3), 776-787.

Rupvath, R. (2016). Tribal Education: A Perspective from Below. *South Asia Research,* 36 (2), 206-228.

Saha, R. (2021). Socio- Economic Condition of Tribal People: A Study on Uttar Dinajpur District of West Bengal. *IJCRT,* 9 (12), 659-661.

Saha, R. (2021). Socio-Economic Condition of Tribal People: A Study on Uttar Dinajpur District of West Bengal. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 9(12), 659-661.

Samanta, S. (2021). Attitude towards Girls' Education and Socio-Economic Status of the Tribal Village in W. B. *IJCRT*, 9(1), 2624-2631.

Saren, G. (2013). Impact of Globalization on the Santals: A Study on migration in West Bengal, India. *IJHSSI,* 2(7), 29-33.

Sen, M. (2018). Tribal Development: A New Vision for Transforming India. *IJRSR*, 9 (12 E), 30118-30121.

Sen, M. (2018) Socio-Cultural Transformation of Santhals in Bolpur Shantiniketan of Birbhum district, West Bengal. *IJCRT,* 9 (3), 3117-3126.

Sharma, P., & Bera, S. (2018). A Comparative Study about Scheduled Tribe in West Bengal, India. *IOSR-JESTFT,* 12 (2), 10-15.

Soren, D. D. L., & Mondal, S. (2019). An Analytical Study of Inter District Tribal Development of Dakshin Dinajpur district, West Bengal. *JHSSS,* 1(5), 39-52.

Talukdar, D., & Mete, J. (2021). Social Media in Changing the Culture of Tribal Community in West Bengal. *ACCESS*, 6 (5), 164-174.

ঘোষ, ফটিকচাঁদ (২০১৯)। 'ডুলুং', *মেদিনীপুরের নদ-নদী কথা,* মাইতি, তাপস (সম্পাদনা), পৃঃ ১৭০-১৮৩।

টুডু বুদ্ধেশ্বর, *সাঁওতাল মহান পরম্পরায় অনুসন্ধানে ব্যস্ত এক মহান জাতির কথা,* পৃষ্ঠা– ৩০, পৃষ্ঠা– ১০৪-১১৭।

বড়পন্ডা, কুমার (২০১৯)। তারাফেনী, *মেদিনীপুরের নদ-নদী কথা,* মাইতি, তাপস (সম্পাদনা)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুশ্রী। ভারতবর্ষের আত্ম পরিচয় (পূর্ব) । *ভারত চিন্তাঃ ভারতের স্বরূপ সন্ধান।* পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান (২০১২) । *প্রসঙ্গ আদিবাসী।* Concept Publishing Company Private Limited, New Delhi.

মাইতি, চন্দ্র (১৪১০)। মেদিনীপুর জেলার প্রস্তর যুগের নিদর্শন: একটি আলোচনা। পশ্চিমবঙ্গ, *মেদিনীপুর জেলার সংখ্যা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মান্ডী কলেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল পূজো পার্বণ,* পৃষ্ঠা- ৪-৬৬।